শুকতারা

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ক্যান ঃ শুভঙ্কর ঘোড়ুই

এডিট ঃ হারিদাস পাল

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকবর্গ ও সাহিত্য যশাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের একমাত্র অবলম্বন

বহু প্রশংসিত বাংলা ভাষার সর্বাধুনিক অভিধান

দুই মাসের জন্য ! আশুতোষ দেব-এর দুই মাসের জন্য !!

নব বিধান

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০৮ মূল্য ৬৲ টাকা দ্বিতীয় সংস্করণ

এতে আছে

১। শব্দাংশ
২। বাংলা বানানের নিয়ম
৩। সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা
৪। বাংলা ধাতু
৫। ব্রজবুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ
৬। শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ
৭। বিবিধ জ্ঞাতব্য
৮। বিখ্যাত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী
৯। প্রবচন-সংগ্রহ
১০। এককাবলী
১১। প্রুফ-সংশোধন-প্রণালী

অভিধানের মূল্য ৬৲ ডাক খরচ ১=৫০ মোট ৭=৫০ ন. প. ৭=৫০ ন. প. স্থলে ৬৲ টাকা পাঠালে রেজেষ্ট্রি ডাকে বই পাঠান হবে।

নব কল্লোল

বড়দের মাসিক পত্র

নববর্ষ সংখ্যায় থাকবে

সম্পূর্ণ চারটি উপন্যাস

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—উপন্যাস
বনফুল —গল্প
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—গল্প
ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত—সম্পূর্ণ উপন্যাস
নরেন্দ্রনাথ মিত্র —সম্পূর্ণ উপন্যাস
রাজকুমার মৈত্র—সম্পূর্ণ উপন্যাস
অবধূত—সম্পূর্ণ উপন্যাস
ডাঃ জীবনকুমার সেনগুপ্ত—শারীরিক
ডাঃ নগেন্দ্রনাথ দে —মানসিক
ডাঃ এন. আর. গুপ্ত—কন্যা কেশবতী
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়—স্মৃতিকথা
সৌরেন গুপ্ত— অঙ্গুলের ভাষা
পঞ্চবর্ষী—জাতিস্মরের শিল্পলোক
আরো গল্প. ফিচার. ছবি, সিনেমা, অন্যান্য চিত্র, কার্টুন আরো অনেক কিছু—বইতে দেখুন

শুকতারা

ছোটদের মাসিক পত্রিকা

৮০ পাতার বই দাম—৫০ নঃ পঃ

জ্যৈষ্ঠ মাসে থাকবে

হাঁদা-ভোঁদা—ছবিতে মজার গল্প
তুষার চ্যাটার্জি—ছবিতে অ্যাডভেঞ্চার
৺হেমেন্দ্রকুমার রায়—ধারাবাহিক উপন্যাস
অবধূত—গল্প
পূরবী দেবী—গুপ্তচর
শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়—গল্প
যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বিজ্ঞানের অভিযান
মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকার—বিশ্বাস হয় কি—

তাছাড়া আরো গল্প, কবিতা, বুদ্ধির খেলা, মজার পাতা, ক্রিকেট খেলা, তা ছাড়া আরো অনেক কিছু।

দেব সাহিত্য কুটীর—কলিকাতা-৯

"শুকতারা"

Approved by the Text-Book Committee, Bihar, as a Supplementary Reader in Secondary and Primary Schools (Children's Monthly Journal).

(Vide Patna Gazette, 30th Dec., 1950)

সূচীপত্র—বৈশাখ, ১৩৭১

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	সর্দারের ভেলকি	তপতীরানী	প্রথম ছবির পিছনে
২।	কপাল পোড়া! (কবিতা)	অসীম রায়চৌধুরী	১৫৩
৩।	বাঙালী-বিভ্রাট (পাদপূরণ)	—	১৫৪
৪।	ইতিহাস না জানার ইতিহাস (গল্প)	বিধায়ক ভট্টাচার্য	১৫৫
৫।	একটুখানি হাসো (মজার কথা)	অশোকা, কমলা দে	১৬৪
৬।	কুকুরমারা মোড় (গল্প)	শ্রীসুনীতি মুখোপাধ্যায়	১৬৫
৭।	জেনে রাখা ভাল (জানবার কথা)	শ্রীসুমিত্র ঘোষ	১৬৮
৮।	নির্ভীক বেটী (জীবন-বিচিত্রা)	পূরবী দেবী	১৬৯
৯।	ছড়া (কবিতা)	হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৭২
১০।	জগৎশেঠের রত্নকুঠী (ছোটদের ধারাবাহিক উপন্যাস)	৺হেমেন্দ্রকুমার রায়	১৭৩
১১।	কোন জিনিসের গন্ধ আছে, কোন জিনিসের গন্ধ নেই কেন?		১৭৮
১২।	গল্প নয়, সত্য (গল্প)	কুমারী তপনী ঘোষাল	১৭৯
১৩।	চশমা (পাদপূরণ)	কুমারী তৃপ্তি গাঙ্গুলী	১৮১
১৪।	শব্দ হলেও যায় না শোনা (বিজ্ঞান)	রাধাশ্যাম দাশ	১৮২
১৫।	গণনার জাদুকর (জীবন-কথা)	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়	১৮৫
১৬।	সখের গোয়েন্দা নিশীথ রায় (চিত্রে গল্প)	তুষারকান্তি চট্টোপাধ্যায়	১৮৬
১৭।	চ্যালেঞ্জ (পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	শ্রীনির্ধনচন্দ্র সর্দার	১৮৮
১৮।	গত মাসের বুদ্ধির খেলার উত্তর	—	১৯১
১৯।	অরণ্য-পর্ব (গল্প)	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১৯২
২০।	ভেবে দেখো (জানবার কথা)	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১৯৭
২১।	বল তো? (মজার নকশা)	—	১৯৭
২২।	জেট নৌকা তৈরি কর	—	১৯৮
২৩।	বহুরূপীর রং বদলায় কেন? (জানবার কথা)	—	১৯৯
২৪।	মাতৃভক্তির পুরস্কার (পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	নন্দদুলাল দেব	২০০
২৫।	মাতৃভক্ত বালকের কাহিনী (পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	কুমারী শিবানী দত্ত	২০২
২৬।	দিদি (গল্প)	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা	২০৫
২৭।	সেয়ানে সেয়ানে (হাস্যকৌতুক)	শ্রীনিতাইচন্দ্র দাস	২১২
২৮।	তরোয়াল মাছ (গল্প)	অরুণকুমার	২১৪

	বিষয়		লেখক-লেখিকা		পৃঃ।
২৯।	বীরবলের কাহিনী (জীবনকথা)	...	রবিদাস সাহারায়	...	২১৮
৩০।	বাবা ঠাণ্ডা (হাস্যকৌতুক)	...	—	...	২২২
৩১।	শুঁটকি আর মুটকি (ছবিতে গল্প)	...	—	...	২২৩
৩২।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি)	...	—	...	২২৪
৩৩।	মা-ছেলে ; মিষ্টি কথা (হাস্যকৌতুক)	...	—	...	২২৬
৩৪।	খুশি মত কর স্ট্রেট ড্রাইভ (খেলাধুলা)		শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২২৭

ছোটদের জন্য ভাল ভাল বই

পাখী কথা কয় ঃ রবিদাস সাহারায়

উপনিষদের গল্প ঃ গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষা ঃ নীরদবরণ বসু

শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ তারাশঙ্কর ঘোষ

পৌষ পার্বণ ঃ কৃতী সোম

বাতাসের কথা ঃ শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য

ধ্রুবতারা ঃ শিবশম্ভু পাল

প্রত্যেকটি বইয়ের দাম ঃ পঁচিশ নয়া পয়সা

❁ প্রাপ্তিস্থান ❁

পাবলিকেশন সেলস অফিস
নিউ সেক্রেটারিয়েট
১নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা—১

পাবলিকেশন্‌স্ ব্রাঞ্চ
ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস
৩৮, গোপালনগর রোড, কলিকাতা—২৭

মহাশক্তি বাতারি কবচ

পক্ষাঘাত ভিন্ন যাবতায় বাতরোগ জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে নিশ্চিত আরোগ্য হইবেই। ভারতের প্ল্যানিং কমিশনার মাননীয় **শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী** মহাশয় এই কবচের গুণাবলীতে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ হইয়াছেন। এই আশ্রমের জ্যোতিষ বিভাগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে তথা ভৃগুসংহিতার সাহায্যে মানবের ভাগ্য নির্ভুল ভাবে বিচার করা হয়।

শ্রীশিবানন্দ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ
কালীবাড় আশ্রম, পোঃ জামসেদপুর, বিহার।
ফোন—সিটি ২৫৭৭-এ।

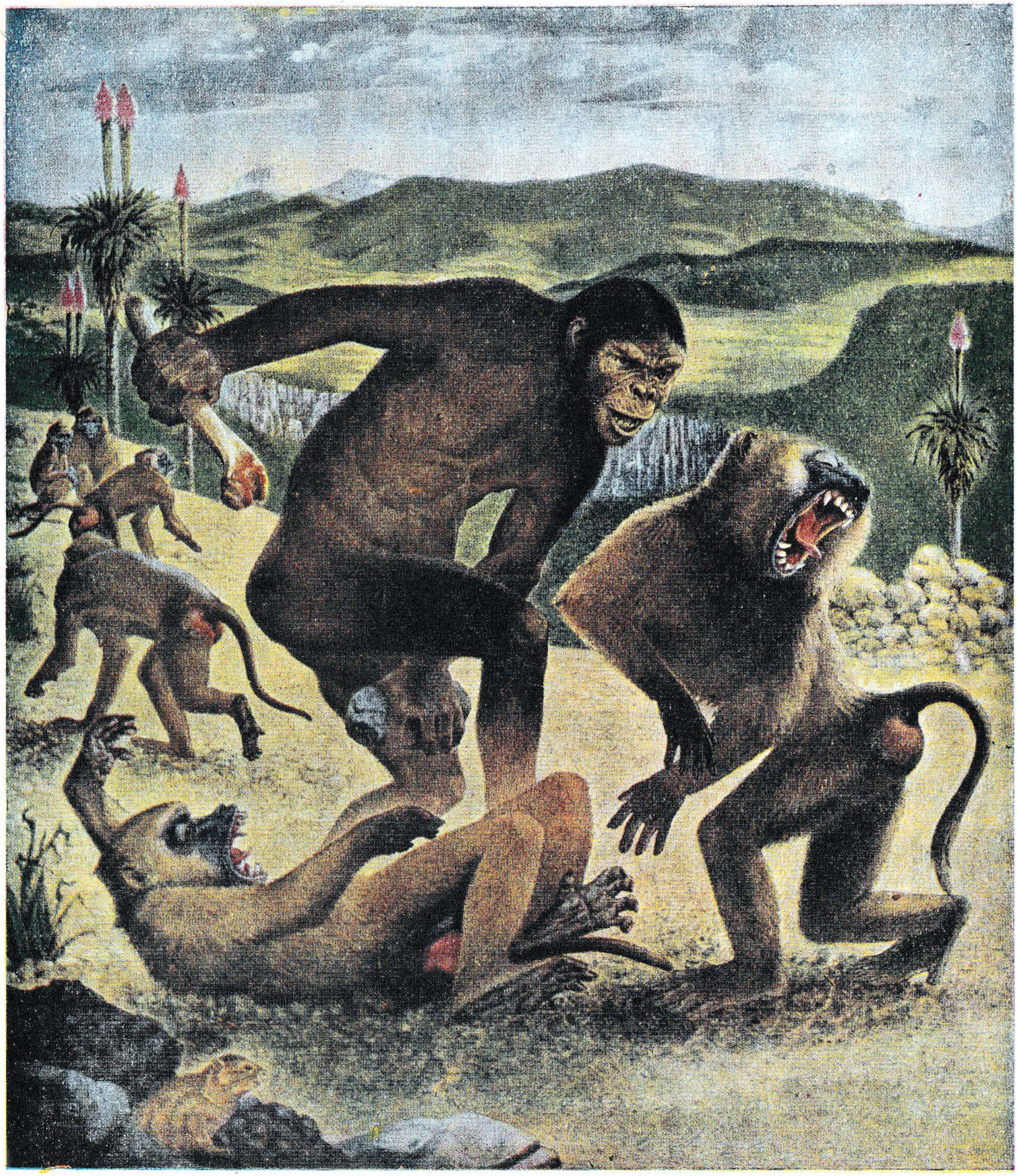

সর্দারের ভেল্কি

সর্দারের ভেল্‌কি

তপতীরানী

শিংপু, বেবুন, বনমানুষ—নানা জাতের জানোয়ার।

তারা দল বেঁধে থাকতো আলাদা আলাদা। সব দলেই ছিল একজন করে সর্দার।

সর্দারকে তারা খুবই ভালবাসতো, মান্য করতো।

একদিন বেবুনদের সর্দার ভাবলে—তাকে দলের লোকেরা কেমন ভালবাসে তার পরখ করতে হবে। তাই সে একটা মাঠের মাঝে মরার মত পড়ে রইল। এমন ভাব দেখালে যেন সে মরে গেছে।

এদিকে সর্দার মরে গেছে দেখে সব বেবুনরা এসে হাজির হল। সর্দারের মৃতদেহের চারপাশ ঘিরে বসল সবাই। বেবুন সর্দারও পিটপিট করে দেখতে লাগল—শোকসভার বহরটা কেমন হয়।

ও মা একি! বেবুনরা কোথায় সর্দারের জন্য শোক প্রকাশ করবে, তা নয়; তারা পরামর্শ করতে লাগল কেমন করে সর্দারের মাংসটা দিয়ে ভোজ লাগাবে।

এদিকে শিংপু-সর্দার দূর থেকে ব্যাপারটা দেখছিল। সে ভাবল—বেবুনের মাংস খাবার এই সুবর্ণ সুযোগ! সে তাড়াতাড়ি হাড় দিয়ে তৈরী লাঠিটা নিয়ে এলো এগিয়ে। যেই একটা বেবুন সর্দারের মাংসটা পরখ করবার জন্য এগিয়েছে, অমনি সেই হাড়ের লাঠিটা দিয়ে মারল কষে এক ঘা।

ব্যস্, ঘা খেয়ে বেবুন বেচারা একেবারে কাবু। আর ওদিকে বেবুন-সর্দার বেগতিক দেখে উঠে পড়ল জ্যান্ত হয়ে।

শিংপু-সর্দার দেখল—একি! এ আবার কেমন ভেল্‌কিবাজি! এত সাধের ভোজ তারও হাতছাড়া।

সপ্তদশ বর্ষ ● ৩য় সংখ্যা ● ১৩৭১, বৈশাখ

কপাল পোড়া!

অসীম রায়চৌধুরী

ও পাতিরাম, শুনছি নাকি
আস্তাবলে পুষিস তোরা
তুর্কী থেকে সদ্য-কেনা
পাঁচশো তেজী তাগড়া ঘোড়া?

দেখতে ভালো?
খুব কি কালো?
লেজ আছে তো?
নয় তো খোঁড়া?
রোজ সকালে আস্তাবলে
ডিম পাড়ে কি দু'এক জোড়া?

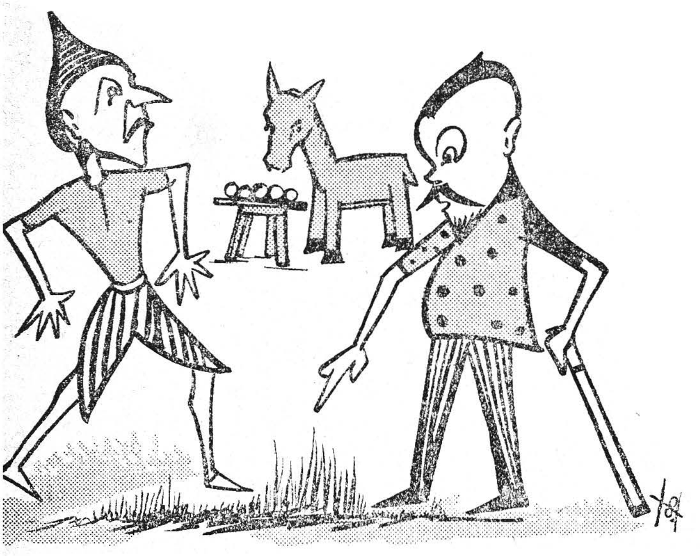

দিনদুপুরে দিস কি খেতে ?
মিষ্টি গজা ? ছানার বড়া ?
সত্যি করে বল না বাছা—
মিঠাইগুলো খায় তো ওরা ?

ও পাতিরাম, তা যদি হয়—
তোদের তবে কপাল পোড়া !
ঘোড়ায় যদি মণ্ডা খাবে
ঘাসগুলো কি গিলবি তোরা ?

বাঙালী-বিভ্রাট

একজন বাঙালী ভদ্রলোক একবার দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে গেছলেন। কোন এক শহরে বেড়াতে বেড়াতে তিনি পথ হারিয়ে অনেক দূরে এসে পড়েন। সেখানকার অধিকাংশ লোকই না জানে বাংলা না হিন্দী। দু'একজন ইংরেজী জানলেও তাদের সংখ্যা নগণ্য।

পথ হারিয়ে ভদ্রলোক দু'চারজনকে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় তাঁর হোটেলে যাবার পথ জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা তাদের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা জানে না। তাই ভদ্রলোকের কথায় কোন উত্তর না দিয়ে চলে যায়।

তখন ভদ্রলোক একটা কাগজে বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে হোটেলের নাম লিখে বুকে ঝুলিয়ে একজন লোকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। লোকটি লেখাটি পড়ে বাঙালী ভদ্রলোককে ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলে কুড়ি মিনিট ধরে এপথ ওপথ ঘুরে হোটেলে এসে উপস্থিত হল।

হোটেলে পৌঁছে মহা খুশী হয়ে ভদ্রলোক পথ-দেখান লোকটিকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় ইংরেজীতে প্রশংসা করলেন। ভদ্রলোককে কথা বলতে দেখে সেই দক্ষিণী লোকটি বিস্মিত হয়ে বলে উঠল' আপনি কথা বলতে পারেন ? আমি ভেবেছি আপনি বোবা কালা।

ইতিহাস না জানার ইতিহাস

বিধায়ক ভট্টাচার্য

তোমাদের আজ একটা আশ্চর্য কথা বলবো। সেই কথাটা হচ্ছে—আমাদেরও একদিন ছেলেবেলা ছিল। অর্থাৎ আমরাও একদিন তোমাদের মতোই ছোট ছিলাম। খুব আশ্চর্য লাগছে, না? কিন্তু বিশ্বাস করো, একটুও বাড়িয়ে বলছি না, বা মিথ্যে কথা বলছি না। সত্যি আমরাও একদিন তোমাদেরই মতো ছোট ছিলাম। তাই আজকে আমাদের সেই হারিয়ে যাওয়া ছেলেবেলার একটা গল্প তোমাদের বলবো। তাই বলে যেন মনে কোরো না যে গল্প বলবার নাম ক'রে আমি তোমাদের শট্‌কে শেখাতে বসেছি, অথবা কোন উপদেশ দিতে চাই। সে সব কিছু না। গল্প, শুধু গল্পই। তবে সত্যিকার।

আমাদের বাড়ি বালুচরে। হ্যাঁ, যে বালুচরী শাড়ির কথা ঠাকুমা দিদিমার কাছে শুনেছ, যে শাড়ি আর এখন একখানাও তৈরী হয় না, মানে তৈরী করবার সব শেষ মানুষটিও মরে গেছে—সেই বালুচরে আমাদের বাড়ি। আর সে যে কী চমৎকার জায়গা (এখন আর নেই) তা তোমাদের কী বলবো! বালুচর শহরও বটে, আবার গ্রামও বটে। শহরের পশ্চিমে ভাগীরথী। পুবদিক—বালুচরের দিক ভাঙছে, পশ্চিমদিকে ধুধু করছে বালির চর, চরের পশ্চিমে বাবলাবন। আমাদের

পাড়ার দক্ষিণদিকে শ্মশান। তার আগে ডোমপাড়া। শ্মশানের পরে দক্ষিণদিকে তখন শুধু ছিল জঙ্গল আর জঙ্গল। সেখান থেকে মাইল দুয়েক গেলে পড়বে জগৎশেঠের বাড়ির ভাঙা স্তূপ। স্তূপের পর স্তূপ। তার অনেকখানিই খেয়েছে ভাগীরথী, কিছুটা এখনো নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ভাঙাচোরা অবস্থায়—ঠিক যেন হাত জোড় ক'রে থরথর ক'রে কাঁপছে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে সেই ভাঙা ভিটে। সবটাই জঙ্গলে ঢাকা। তার মধ্যে আছে বিষধর সাপ এবং আরো অনেক কিছু।

মনে রেখো, যে সময়ের কথা বলছি সেটা অন্ততঃ চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর আগেকার কথা। আমাদের তখন বারো তেরো বছর বয়েস। জগৎশেঠের ভাঙা ভিটের পুবদিক দিয়ে গঙ্গার ধারে ধারে যে পাকা সড়ক নশীপুর-লালবাগ-বহরমপুর হ'য়ে কোলকাতা অবধি চলে গেছে, তখনকার দিনে সে রাস্তায় সন্ধ্যের পর লোক চলাচল করতো না। তার কারণ অতখানি নির্জন পথ। তা ছাড়া সাপের ভয়, বাঘের ভয়। এ ছাড়া আরো একটা ভয় ছিল—সেটা হচ্ছে ভূতের ভয়। ওই পথে সন্ধ্যের পর অন্ধকারে, কিংবা পূর্ণিমার দিন ফিন্‌ফোটা জ্যোৎস্নায় কত লোক যে ভয় পেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেছে, তার আর ঠিকঠিকানা নেই।

ঠাকুরদার কাছে বসে গল্প শুনছিলাম আমি, কমরু, তারা, ভক্তি আর সুশীলকাকা। আমরা চার বন্ধু। আর সুশীলকাকা বাবার বন্ধু। কথায় কথায় জগৎ-শেঠের প্রসঙ্গ আসতেই ঠাকুরদা বললেন—ওই ভাঙা স্তূপ থেকে কত লোক যে বড়লোক হ'য়েছে তা জানিস?

—বড়লোক হ'য়েছে? কম্‌রু প্রশ্ন করলো।—কেমন ক'রে দাদু?

—তবে শোন্। ওই যে বাজারের ধারে হনুমান সিংয়ের সোনা-রূপোর দোকান আছে। হনুমান বেঁচে নেই। কিন্তু সেই তো পেয়েছিল।

—সেকি! কী রকম ক'রে? দাদুর গা ঘেঁষে বসে জিগ্যেস করলাম।

—হনুমান তখন দেশ থেকে এসেছে। সঙ্গে বৌ আর তিনটে ছোট ছোট বাচ্চা। বাজারে মুটেগিরি শুরু করলো। কিন্তু পাড়াগাঁর শহর এটা। লোকে তো মুটের মাথায় চাপিয়ে বাজার করে না। নিজেরাই ব'য়ে আনে। ফলে বৌ ছেলেপুলে নিয়ে হনুমান সিংয়ের খুব কষ্ট। কোনদিন খেতে পায়, কোনদিন পায় না।

শেষকালে বৌ ছেলের কষ্ট দেখতে না পেরে ঠিক করলো সে আত্মহত্যা করবে। কিন্তু কোথায়? সে শুনেছিল যে প্রতি পূর্ণিমার মধ্যরাত্রে মা লক্ষ্মী সশরীরে জগৎ-শেঠের ভাঙা ভিটেয় এসে মানুষের রূপ ধরে শেঠজী শেঠজী শেঠজী বলে তিনবার কাঁদেন। তারপর মিলিয়ে যান। হনুমান ঠিক করলো, মরতেই যদি হয়, তবে মা লক্ষ্মীর সামনে মরাই ভাল। সে ঠিক করলো—পরদিন পূর্ণিমা। রাত্রে সে জগৎশেঠের ভাঙা ভিটেয় যাবে। গেলেই সাপে কামড়াবে, তারপর মা লক্ষ্মীর সামনে সে দেহত্যাগ করবে।

পরদিন রাত্রে কাউকে কিছু না বলে সে গেল সেখানে। সাপে অবশ্য কামড়ালো না। রাত বারোটার সময় পদ্মগন্ধে চারদিক ভরে উঠলো। হনুমান দেখলো চারদিক আলো ক'রে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে এসে দাঁড়ালেন। শেঠজী শেঠজী শেঠজী বলে তিনবার কাঁদলেন। তারপর আস্তে আস্তে হনুমানের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন—এখানে কী করছিস?

—মরবো বলে এসেছি।

—কেন?

—দারিদ্র্য। ছেলেপুলে নিয়ে খেতে পাচ্ছি না মা।

—আমার সঙ্গে আয়। দেবী বললেন।

একটু তফাতে একটা জায়গায় মাটিতে ফাট ধরেছে। সেইখানে গিয়ে দেবী বললেন—এই মাটির নীচে যা আছে নিয়ে যা। কিন্তু এমনি দেবো না। তোর একটি ছেলে দিতে হবে। কোন্ ছেলেকে নেব, বল!

—ছোটছেলে। ফস্ ক'রে বলে বসলো হনুমান। দেবী মিলিয়ে গেলেন।

হনুমান মাটির চাপড়া তুলে ফেলে দেখলো তার মধ্যে একটা তামার বড় জালা। রূপোর তার দিয়ে মুখের ঢাকনা আটকানো। জায়গাটা দাগ দিয়ে ফিরে এলো হনুমান। তারপর প্রত্যেকদিন রাত্রে গোপনে গিয়ে সেই জালার মধ্যেকার পঞ্চাশখানা সোনার ইঁট বাড়িতে নিয়ে এলো।

—ছেলেটা? ভক্তি যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

—ছোটছেলেটা মুখে রক্ত উঠে সেই রাত্রেই মরে গেল।

—যাঃ! তারার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো।—তারপর?

তারপর প্রত্যেকদিন রাত্রে গোপনে গিয়ে··· [পৃষ্ঠা ১৫৭

—তারপর আবার কী? সোনা-রূপোর দোকান করলো হনুমান। রায়-সাহেব হ'য়ে মরেছে। ছেলেরা এখন জমিদার।

বলা বাহুল্য গল্পটা মাথার মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল সকলের। এর দিন দশেক পরে একটা ফুটবলের ম্যাচ—দিন স্থির হ'য়েও খেলা হ'ল না। না হবার কারণ ফুটবলের অভাব! ফুটবল মানে—বাতাবিলেবু। কেউ দিল না। আর রবারের ছোট বল। দু আনা দাম। পয়সা জুটলো না। প্রতিপক্ষ খেলতে এল। বেগমগঞ্জের ছেলেরা। বল যোগাড় হয়নি শুনে যাচ্ছেতাই ক'রে টিটকিরি দিয়ে গেল।

সবাই চলে গেল। বসে রইলাম সেই চার বন্ধু। চারজনেই এগারো থেকে বারো বছরের ছেলে। এখন যেমন ছেলেরা বুড়োমি করে আর বুড়োরা ছেলেমি করে, তখন কিন্তু তা ছিল না। তখন ছেলেরা ছিল ছেলেমানুষ। আর বুড়োরা একেবারে বিজ্ঞ বুড়ো। জীবনের অনেক কিছুই অজানা।

মাঠের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হ'য়ে উঠলো। শেয়াল ডাকলো। জোনাকিরা আলো দিতে বেরিয়ে পড়লো। আমরা বসেই আছি।

—এ অপমান অসহ্য! কমরু বললো।

—এরপর বাঁচা না-বাঁচা দুই সমান। ভক্তি বললো।

—ছ্যাঃ! আমি বললাম।

তারা বললো—দু আনা পয়সা,—সে কি পয়সা!

হঠাৎ কম্‌রু দাঁড়িয়ে পড়লো। বললো—বগলা! (আমার ডাকনাম)

—কী?

—পূর্ণিমা কবে?

—কেন?

—জগৎশেঠের ভাঙা ভিটেয় যাব আমরা। পঞ্চাশখানা নয়, একখানা সোনার ইঁট দরকার। একখানা পেলেই আমরা ভগবানগোলা থেকে বাতাবিনেবু কিনে আনবো। পয়সার কষ্টের কথা যদি বলতেই হয়, তাহ'লে মা লক্ষ্মীকেই বলা ভাল।

গভীর চিন্তা মাথায় নিয়ে সবাই বাড়ি ফিরলাম।

পরদিন ইস্কুলে আবার মিটিং।

—পূর্ণিমা কবে? ভক্তি জিগ্যেস করলো।

—কাল। আমি বললাম। একটু ভয়ে ভয়েই।

—তাহ'লে কালকেই চল্ চারজনে যাই। আমার মন বলছে ওখানে গেলেই ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে। দাদুর কাছে শুনিসনি, এখনো শেঠের ভিটেয় কোটি কোটি টাকা লুকোনো আছে? কম্‌রুর উৎসাহ সব চাইতে বেশী।

—কিন্তু অত রাত্তিরে! বাড়িতে বকবে যে! ভক্তি বললো।

—কিছু না। কম্‌রু বললো।—বলবি আমার বাড়িতে পরীক্ষার পড়া তৈরী করবি। চারজনে আমরা রাত জেগে পড়বো।

তাই হ'ল। বাড়িতে বলা হ'য়ে গেল। তবু পরদিন সকালে উঠে আমার মনটা কীরকম খুঁত-খুঁত করতে লাগলো। পথে বেরিয়ে সুশীলকাকার সঙ্গে দেখা। তাঁকে বললাম প্ল্যানটা। শুনে তিনি গম্ভীর হ'য়ে বললেন—পাওয়াটা কিছু আশ্চর্য নয়। তবে সাবধানে যাবি, একসঙ্গে থাকবি, আর নশীপুর রাজবাড়ি থেকে রাত একটা বাজার ঘণ্টা শুনলে বাড়ি চলে আসবি।

সন্ধ্যে থেকে সে কী উত্তেজনা! কম্‌রুর বাড়িতে খাওয়াদাওয়া সেরে জড়ো

হ'য়েছি। রাত নটা বাজলো, দশটা বাজলো। আমি বললাম—যেতে হ'লে আর দেরি করা উচিত নয়।

বেরিয়ে পড়লাম। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা। দিন হ'য়ে গেছে পথঘাট।

ভট্টপাড়ার মোড়ে পড়তেই অন্ধকার দোকান থেকে আওয়াজ এলো—কে যায়?

সর্বনাশ। দাঁড়িয়ে পড়লাম। পাড়ার গুরুজনস্থানীয় ব্যক্তি। বললেন—কোথায় যাচ্ছিস রে তোরা?

—কোথাও না। আমি বললাম।—রাত জেগে পড়াশুনো করছি কিনা। তাই একটু হাওয়া লাগাচ্ছি।

—ঠিক আছে। জবাব এলো।

লাইন ক্লিয়ার পেয়ে এগিয়ে গেলাম। ভক্তি হিসেবী মানুষ। বললো—আচ্ছা ভাই কম্রু, সোনার ইঁট একখানার জায়গায় যদি চারজনে চারখানা নিই। তাহ'লে কি খুব দোষ হবে?

কম্রু জৈনদের ছেলে। একবগ্গা। বললো—যাবো না তাহ'লে। লোভ হ'য়ে যাচ্ছে তোদের। শুনিসনি—লোভে পাপ, পাপে মিত্যু!

—না না চল্! আমাদের কোন লোভ নেই।

—ঠিক বলছিস তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। সবাই সমস্বরে বললাম।

শ্মশান পার হ'য়েছি, তারস্বরে একটা কুকুর ডাকতে ডাকতে পেছনে চললো। হঠাৎ তারা থেমে গেল। কাঁপা গলা শোনা গেল।—বগলা!

—কী রে? বললাম।

—আমার পায়ের শির টেনে ধরেছে। তোরা যা।

—চালাকি পেয়েছিস! কম্রুর চাপা গর্জন।—এতদূর এসে ডোবাবি? চল্, তোকে ঘাড়ে ক'রে নিয়ে যাই। এই বলে বলবান কুমার সিং সত্যই তারা সাহাকে ঘাড়ে তোলবার চেষ্টা করতেই তারা বললো—টানিসনে। লাগবে যে! চল্ যাচ্ছি।

সতীচূড়োর মোড়। আর একটুখানি গেলেই জগৎশেঠের ভিটে। এই সতীচূড়োয় শোনা যায়, আগে নাকি সতীদাহ হতো। ঝিমঝিম করছে রাত।

গঙ্গার ওপার থেকে কী একটা পাখি ডাকছে —কর্কশ আওয়াজ। ভক্তির চিঁচিঁ গলা শোনা গেল—আর বাড়ি ফিরবো কিনা, তাই বা কে জানে?

—আবার কথা বলে! কম্রুর ধমক।

সত্যি সত্যি এবার এসে দাঁড়ালাম জগৎশেঠের ভিটের ধারে। এখান থেকে নেমে জঙ্গল আর ভাঙা ইঁটের পাঁজার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে হবে গঙ্গার ধারে। হঠাৎ 'বাপ্‌রে' বলে পেছনে আওয়াজ

দেবী এগিয়ে এলেন। [পৃষ্ঠা ১৬২

হতেই দেখা গেল তারা ঠকঠক ক'রে কাঁপছে। আমরা চাইতেই সে বললো—প্রকাণ্ড সাপ।

—চলে আয়। কম্রুর হুকুম।—হনুমানকে কামড়ায়নি। তোকেও কামড়াবে না।

গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ালাম। এখান থেকে প্রায় ত্রিশ ফুট নীচে গঙ্গা। খাড়া পাহাড়ী নেমে গেছে। একটা শুকনো মাদারগাছের নীচে চারজনে বসলাম। এত নিস্তব্ধ যে নিজেদের বুকের ঢিপঢিপ শোনা যাচ্ছে। নতুন এক উপসর্গ। মশা কামড়াতে লাগলো। অসহ্য যন্ত্রণা। আকাশে কালো মেঘ। মাঝে মাঝে

পূর্ণিমার চাঁদকে ঢেকে ফেলছে আবার ছেড়ে দিচ্ছে। ঢাকলেই মনে হচ্ছে জগৎ-শেঠের ভিটে যেন চোখ বন্ধ করলো।

দূরে নশীপুর রাজবাড়ির দেউড়িতে ঘণ্টা বাজছে। কম্রু চাপাগলায় বললো—গোণ ! এগারোটা না বারোটা। বারো। সকলেই গুণেছি। সময় হ'য়েছে। আয় এবার আমরা সবাই 'মা' 'মা' বলে আস্তে আস্তে ডাকি। তাহ'লেই থাকতে না পেরে নেমে আসবে। সবাই তখন মা মা বলে ডাকতে আরম্ভ করলাম।

একটু কাল। পরক্ষণেই সামনের জঙ্গল আর ভাঙা স্তূপের মধ্যে থেকে নারী-কণ্ঠের কান্নাজড়ানো আকুল ডাক ভেসে এলো—শেঠজী—ই—ই—ই ! সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে শুনলাম তারা আর ভক্তির দ্রুত আবৃত্তি—'রাম—রাম—রাম—রাম—রাম'—। মরিয়ার মত আমি ধমক দিলাম।—এই ! রাম রাম বলছিস কেন ? একি ! ভূত পেয়েছিস ? এ যে মা লক্ষ্মী ! রাম রাম শুনলে যদি চলে যায় ! চেয়ে দেখলাম—সত্যি স্তূপের পেছন দিকটা দিনের আলোর মত উজ্জ্বল হ'য়ে গেল। আবার শোনা গেল—শেঠজী—ই—ই—ই ! এইবার দেখলাম,—হ্যাঁ দেখলামই আমরা। মা এগিয়ে আসছেন। দেবীই বটে। সর্বাঙ্গে হীরে মুক্তোর গয়না। মাথায় মুকুট। পায়ে নূপুর। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছেন। ডান হাতটি বরাভয় মুদ্রায় তোলা। সেই হাতে একটি পেট্রোম্যাক্স আলো। চেয়ে আছি, চেয়ে আছি—চারজনের পলক পড়ছে না। দেবী এগিয়ে এলেন। সোজা আমার দিকে দুটি কাজলপরা চোখ মেলে বললেন—কী চাস ?

—কিছু না। বলে ফেললাম। তুচ্ছ পার্থিব জিনিস চাইব ? বিবেকানন্দের মতো বলতে গেলাম—মোক্ষ। গলাটা কেঁপে গিয়ে বেরোলো—চাই মোক্ষম।

—তুই ? এবার কম্রু। দুরন্ত সাহস ওর। বললো—একখানা সোনার ইঁট।

—কী করবি ?

আশ্চর্য ! কম্রু দমলো না। সমানে বলে যাচ্ছে।—বাতাবিনেবু কিনবো।

—কাকে দিবি ? কাকে খাব ?

নির্ভীক কম্রু জবাব দিল—আমাদের পাঠশালার হেডমাস্টারকে।

উঃ ! কী উপস্থিতবুদ্ধি ওর ! এই সময়ে আমাদের সব চাইতে বড় শত্রুর নাম ক'রে দিয়েছে। যদি আজ লক্ষ্মীছাড়া (মানে হাতছাড়া) হ'তে পারি, তবে ওর পায়ের ধুলো নেব।

মা এইবার চাইলেন ভক্তি আর তারার দিকে। বললেন—তোরা কী চাস ?

কিছুই চায় না। ওদের বাক্‌রোধ হ'য়ে গেছে। চাইবে কী? দাঁতে দাঁত লাগা—দু'জনের মুখ দিয়ে শুধু ভূ-ভূ-ভূ-ভূঃ আর মু-মু-মু-মুঃ, এই রকম আওয়াজ হচ্ছে।

ততক্ষণে কম্‌রুর সাহস বেড়েছে। বললো—মা, তোমার গলার আওয়াজটা এত নাকী নাকী কেন ?

হারামজাদা ! এই তোমাদের পরীক্ষার পড়া ? [পৃষ্ঠা ১৬৪

—সর্দি হ'য়েছে রে ব্যাটা। শেঠজীর জন্যে কাঁদতে কাঁদতে গঙ্গার হাওয়ায় সর্দি লেগেছে।

—শেঠজী তো কবে মরে গেছে মা, তুমি এখনো কাঁদ কেন ? সাবাস কম্‌রু।

—আর কাঁদবো না বাবা। আজ থেকে তোদের জন্যে কাঁদবো।

হঠাৎ একটা প্যাঁচা ডেকে উঠলো। আমার সাহসও বেড়েছে ততক্ষণে। বললাম—মা, তোমার প্যাঁচা এসে গেছে। তুমি তো এখনি চলে যাবে ! তার আগে থান ইঁটের ফাটা জায়গাটা দেখিয়ে দাও মা।

—বগলা !

সাড়া দিলাম—কী বলছো মা ? বলেই মনে হ'ল মায়ের গলাটা বাবার গলার মতো লাগলো কেন ?

—হারামজাদা ! এই তোমাদের পরীক্ষার পড়া ?

ব্যস্। ওই অত বড় হিমালয়ের মত কম্রু—ধপ্ ক'রে পড়ে গেল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে কাটা কলাগাছ পড়ার মতো আরো তিনটি শব্দ। শেষেরটা আমার।

চোখ চাইলাম। চারটি দেহ গঙ্গাজলে নাওয়া। জগৎশেঠের ভাঙা ভিটেতে আলোর রোশনাই। পেট্রোম্যাক্স, হ্যারিকেন, মোমবাতি, কুপি। লোকে লোকারণ্য। চোখটা আর একটু ফাঁক ক'রে দেখলাম—সামনে বাবা—হাতে জলবিছুটি, কম্রুর জেঠা—হাতে চাবুক, ভক্তির দাদা—হাতে লাঠি, আর তারার কাকা—হাতে গরু বাঁধবার দড়ি।

কম্রুর ফিসফিস আওয়াজ—আবার অজ্ঞান হ'য়ে যা !

আবার অজ্ঞান হলাম। হ্যাঁ, চারজনেই।

লক্ষ্মী নয়—সুশীলকাকা। ভারতী নাট্যসমাজে সাজাহানে জাহানারার পার্ট করতো। পুরো জাহানারার পোশাক পরে চলে এসেছে।

নীচু ক্লাসে পড়লে তো ইতিহাসের পোশাক চেনা যায় না,—এ ঘটনা তারই করুণ ইতিহাস।

একটুখানি হাসো

(১)

বন্ধু—ভাই, গোটা পঞ্চাশ ইঁদুর আর হাজার পাঁচেক আরশোলা দিতে পার ?

অপর বন্ধু—সেকি ! অত ইঁদুর আরশোলা নিয়ে কি করবে ?

বন্ধু—আর বলো না। বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি শুনে বাড়িওয়ালা বলেছে ভাড়া নেবার সময় যেমনটি ছিল ঠিক সেরকমটি রেখে যেতে হবে।

(২)

জজ ঃ (আসামীকে)—আড়াই টাকা পকেট মারার জন্য তোমার দশ টাকা জরিমানা হল।

আসামী—ঠিক আছে হুজুর। বাকী সাড়ে সাত টাকা এখুনি পকেট মেরে এনে দিচ্ছি।

—অশোকা, কমলা দে

কুকুরমারা মোড়

শ্রীসুনীতি মুখোপাধ্যায়

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের একটা মোড়। বর্ধমান জেলার শক্তিগড় আর গাঙপুরের মাঝামাঝি। আপ-ডাউনের সব বাস এখানে থামে। বাসের কণ্ডাকটর বা যাত্রীরা কেউ এই স্টপটার নাম মুখে আনে না। কারণ, স্টপটার নামের নামে একটা কলঙ্ক রটে গেছল। কোন শুভ কাজে যাবার কালে এই জায়গাটার নাম বললে বা শুনলে নাকি সে কাজ সফল হয় না। বেচারা স্টপটা কথা বলতে পারে না তাই, না হ'লে ও বোধহয় ওদের নামে মানহানি মামলা বাধিয়ে ছাড়তো। 'এই যে বাবু···নাম বলবো না···' বলে কণ্ডাকটর হাঁক দিলেই যাত্রীরা বুঝতে পারতো বাসটা কোথায় এলো। কারও নামবার দরকার হ'লে 'রোখো' 'রোখো' বলে সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াতো।

এ অঞ্চলের গজানন চৌধুরীকে আর সবাই নগণ্য মনে করলেও নিজেকে তিনি গণ্যমান্য মনে করতেন। সুদের কারবারে তিনি তাঁর তহবিলটিকে ফাঁপিয়ে-ফুলিয়ে তুলেছিলেন। টাকার চড়া সুদ আর সম্পত্তিতে কড়া নজর—এ দুটি ব্যাপারে তিনি সত্যিই দশজনের একজন। তিনি নামের কাঙাল। প্রায়ই তাঁর প্রতিবেশীদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন, 'আমি যে যে-সে লোক নই, তা' তোমরা না বুঝলেও বুঝেছে ওপাড়ার ওই গণ্শা বাগ্দী।'

পাড়ার ছেলেরা আড়াল থেকে বলতো, 'গজাননকে গণেশ চিনবে না তো চিনবে কে ? দু'জনেই যে সমান। একজন সুদখোর, আর একজন গাঁজাখোর।'

গণ্শা বাগ্দী গজাননের খুব পোষ মেনে গেছলো। গণ্শার গাঁজার খরচটা চৌধুরীমশাই খুশী হয়ে নিজের পকেট থেকেই দিতেন। কারণ, নেশায় বুঁদ হয়ে গণ্শা যে ক'টা কথা বলতো, তা' চৌধুরীকেই উদ্দেশ্য ক'রে : 'কত্তা, তুমি কি মানুষ গা, তুমি ছাবতা। আমার ভাগ্যি ভালো তাই রোজ তোমার ছিরিচরণ দেখতি পাই।'

নামের কাঙাল এই চৌধুরীমশাই ঠিক করলেন, ওই অপয়া বাস স্টপটার কাছে

তাঁর প্রতিবেশীদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন,··· [পৃষ্ঠা ১৬৫

সুদের টাকা থেকে একখানা তিনতলা বাড়ি তুলে সপরিবারে ওই বাড়িতে উঠে যাবেন। বাড়িটার সামনে তৈরি করাবেন মস্ত ফটকওয়ালা একটা ফুলের বাগান। ফটকের মাথায় সোনালী রঙে লিখিয়ে দেবেন— 'গজাননের বাগানবাড়ি'। ব্যস্, তাহ'লেই বাজি মাৎ! অপয়া স্টপটার নাম নিশ্চয়ই পালটে যাবে! কণ্ডাকটর আর যাত্রীরা নিশ্চয়ই ওই অলক্ষুণে নামটা থেকে রেহাই পেয়ে 'গজাননের বাগানবাড়ি' বলে হাঁক দেবে। তাহ'লেই তাঁর নামটা ক'লকাতা থেকে সেই সুদূর পঞ্জাব পর্যন্ত দিনে বিশবার ছুটোছুটি করবে! আর, তখন তাঁর গাঁয়ের ওই নিমকহারাম লোকগুলোকেও নিশ্চয়ই তাঁর বাগানবাড়ির নাম করেই বাসের টিকিট কাটতে হবে! চৌধুরীমশাই খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলেন।

অবশেষে গজানন চৌধুরীর বাগানবাড়ি তৈরী হয়ে গেলো। তিনি শখ ক'রে বাগানে ঢোকবার মুখেই লাগালেন একটি অশোকগাছ। যথাসময়ে বাগানের ফটকের মাথায় সোনালী অক্ষরে 'গজাননের বাগানবাড়ি'র নামও রোদে চিকচিক করতে লাগলো। কিন্তু বাসযাত্রী বা কণ্ডাকটরদের মুখে সে-নাম কিছুতেই চালু হতে চাইলো না।

চৌধুরীও চালু লোক। তিনি গণ্শাকে দিনে ত্রিশবার বাসে এখানে-ওখানে পাঠাতে লাগলেন। ফেরার পথে টিকিটের পয়সা নিয়ে কণ্ডাকটর 'কোথা নামবেন' বলে জিজ্ঞেস করলেই গণ্শা বাসসুদ্ধ লোককে শুনিয়ে হেঁকে বলে উঠতো, 'গজাননের বাগানবাড়ি।'

—'ও-নামে তো আমাদের রুটে কোন স্টপ নেই। কোথা যাবেন ঠিক ক'রে বলুন' —কণ্ডাকটর বলে।

গণ্‌শা বলে, 'স্টপ নেই কি মশাই! ওই যে নাম করতে নেই, ওই স্টপটার ঠিক পাশেই যে বিরাট নতুন বাগানবাড়ি…'

'ও-নামে তো আমাদের রুটে কোন স্টপ নেই।

—'আরে জি. টি. রোডে অমন কত বাগানবাড়ি দেখছি, কে অত খেয়াল রাখে মশাই। ধরুন, টিকিট ধরুন।'

কৃপণ সুদখোর গজানন চৌধুরী গণ্‌শার পিছনে অনেক পয়সা খরচ করলেন। তবু তাঁর বাগানবাড়ির নাম চালু হলো না।

ফটকের পাশের অশোকগাছটা কিন্তু চুপচাপ বসে ছিল না। মালীর যত্নে অল্পদিনে বেশ বড়সড় হয়ে উঠলো। একদিন চৌধুরীমশাই ফটকের বাইরে এসে তাঁর নামটার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছেন, এমন সময় 'অ-শো-ক ত-লা'… কণ্ডাকটরের সুরমেশানো হাঁকে তিনি আরও হাঁ হয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে বাসটা থেমে যেতে কয়েকজন যাত্রী নেমে এলো।

চৌধুরীমশায়ের যত রাগ গিয়ে পড়লো তাঁর শখের ওই অশোকগাছটার ওপর। রাগ তো হবারই কথা! পয়সা খরচ ক'রে তিনি তাঁর নাম চালু করতে পারলেন না, আর ব্যাটা গাছ তাঁরই ভিটেয় বড় হয়ে তাঁর নামকে ছাপিয়ে গেলো! তিনি সেই দিনই কাঠুরে লাগিয়ে অশোকগাছটাকে কাটিয়ে দিলেন।

অশোকগাছ না থাকায় স্টপটার 'অশোকতলা' নাম মুছে গেলো। চৌধুরী

আশান্বিত হলেন। 'গজাননের বাগানবাড়ি'—কণ্ডাকটরদের গলায় এই নামটা যেন তিনি তাঁর বৈঠকখানায় বসে নিজের মনেই শুনতে লাগলেন। কিন্তু কেউ ভুলেও সে-নামে টিকিট কাটলো না। স্টপটার ভাগ্য ভালো। বেশীদিন তাকে তার অশুভ নামের বোঝা বয়ে বেড়াতে হলো না। একদিন গজানন তাঁর পোষা কুকুরটাকে নিয়ে জি. টি. রোডে বেড়াচ্ছিলেন। দৈবাৎ চেনটা তাঁর হাত ফসকে যেতেই কুকুরটা রাস্তার মাঝখানে চলে গেলো। আর, একখানা বোঝাই ট্রাক কুকুরটাকে চোখের নিমেষে পিষে দিয়ে বেরিয়ে গেলো। কুকুরটার আর্তনাদ আর গজাননের চীৎকারে অনেক লোক জুটে গেলো। দু'পাশের গাড়ি কিছুক্ষণের জন্যে থেমে গেলো। এই সুযোগে গজানন সবাইকে তাঁর নাম শোনাবার জন্যে চীৎকার ক'রে বলতে লাগলেন, 'জানো, ওটা গজাননের বাগানবাড়ির কুকুর! ট্রাক-ড্রাইভারকে শ্রীঘর দেখিয়ে ছাড়বো।'

কিন্তু হায়! গজাননের বাগানবাড়ির নাম তো চালু হলোই না, বরং কুকুরটাও মরে গিয়ে চৌধুরীর নামের সঙ্গে শত্রুতা করলো। সেদিন থেকে স্টপটার নাম হলো—'কুকুরমারা মোড়'।

জেনে রাখা ভাল

শ্রীসুমিত্র ঘোষ

১। পাথরকুচি ঃ—নাম শুনেই যেন ভেবে নিও না যে পাথরের কুচি। আসলে কিন্তু তা নয়। পাথরকুচি একপ্রকার গাছ। শুনলে অবাক হবে যে, এই গাছের পাতা ঝরে পড়লে পাতাই আস্তে আস্তে জড়ে (Rootএ) পরিণত হয়।

২। রক্ত কি কখনও নীল হয়? ঃ—তোমরা কি জান. কাঁকড়া, ঝিনুক, শামুক ও কেঁচোর রক্ত নীল?

৩। TITMOUSE ঃ—MOUSE আছে বলে মনে করে নিয়ো না এটা একটা ইঁদুর; কিন্তু শুনে আশ্চর্য হবে যে এটা একটা পাখি।

৪। UNIVAC কি জান? ঃ—এটা বৈদ্যুতিক মস্তিষ্ক (Electric Brain). Univac এর নাম। বাইবেলের সূচী তৈরি করতে পণ্ডিতদের তিরিশ বৎসর সময় লেগেছিল। সেই কাজটা যদি এই যন্ত্রে করা হয় তবে মাত্র দুই বৎসর সময় লাগবে।

নির্ভীক বেটী

পূরবী দেবী

●

তার নাকের ওপর মুষ্ট্যাঘাত করলে।

ভাল্লুক খেলানো তোমরা অনেকে দেখেছ।

কিন্তু ভাল্লুকের উলটো ডিগবাজি খাওয়া কখনও দেখেছ কি? দেখেছ বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। কারণ পৃথিবীতে মাত্র একটা ভাল্লুকই ডিগবাজি খেতে পারে। আর সে ভাল্লুকটা এদেশে আজ অবধি আসেনি।

ঘটনাটা ঘটেছিল খুবই আকস্মিকভাবে।

ক্লাইড বেটী একজন সার্কাসের কর্মী, বাঘ সিংহ ভাল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু নিয়ে খেলা দেখাত। একদিন খেলা দেখাবার সময়ে ভাল্লুকটা ক্ষেপে গিয়ে দাঁত বার করে নখ তুলে বেটীকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে।

বেটী যে এই রকম সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়বে সেটা সে আগে বুঝতে পারেনি। হাতেও কোন অস্ত্র নেই যা দিয়ে আত্মরক্ষা করবে। এদিকে ভাল্লুকটা হাতের নাগালের মধ্যে এসে গেছে। আর কোন উপায় না দেখে বেটী প্রচণ্ড জোরে তার নাকের উপর মুষ্ট্যাঘাত করলে।

শরীরের আর কোন স্থানে আঘাত লাগলে ভাল্লুক মোটেই বিব্রত হয় না কিন্তু নাকের উপর ইয়ারকি করা তার সহ্যের বাইরে। একটু লাগলেই সারা শরীর ঝনঝন

করে ওঠে। নাকটা তার অত্যন্ত স্পর্শকাতর প্রত্যঙ্গ। তাই নাকে আঘাত লাগায় যন্ত্রণায় শিউরে উঠে ভাল্লুকটা পিছিয়ে গিয়ে একটা উলটো ডিগবাজি খেলে।

তাই দেখে বেটীর মনে হল—বাঃ, এই বেশ তো! একে ডিগবাজি খাওয়া শেখাতে পারলে একটা মজার খেলা হয়। তারপর থেকে প্রদর্শনীর সময় খেলা দেখাবার চাবুকটা দিয়ে ভাল্লুকটার নাক স্পর্শ করলেই সেটা উলটে ডিগবাজি খেয়ে নিত। তাই দেখে দর্শকদের হাসির শেষ থাকত না।

পৃথিবীতে ক্লাইড বেটীই হল একমাত্র লোক যে ভাল্লুককে ডিগবাজি খাওয়াতে শিখিয়েছে।

শুধু ভাল্লুক নয় বাঘ সিংহ হাতি হায়না ও আরো সব হিংস্র বুনো পশু নিয়ে বেটী সার্কাসে খেলা দেখিয়েছে। তার দেখানো সব খেলা এমন মারাত্মক ও বিপদ-সংকুল হত যে খেলা শেষ না হওয়া অবধি দর্শকরা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকত। বেটীর একটা খুব প্রিয় খেলা ছিল। খেলা দেখানো সিংহটাকে হাঁ করিয়ে সে তার মুখের মধ্যে নিজের মাথাটা সম্পূর্ণ ঢুকিয়ে দিত। যতক্ষণ না সে মাথাটা নিরাপদে বাইরে এনে দর্শকদের অভিবাদন জানাত ততক্ষণ ভয়ে দর্শকদের নিশ্বাস অবধি পড়ত না। বেটীর সহকারীরা তো ধরেই নিয়েছিল যে কোন মুহূর্তে তার জ্যান্ত শরীরটা এই সব বুনো জন্তুদের খাদ্য হয়ে যেতে পারে।

খেলা দেখাবার সময় বেটী মাঝে মাঝে জন্তুদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখে। বিশেষ করে যে জন্তুটা কথা শুনতে চায় না তার দিকে তার একাগ্র দৃষ্টিটা যেন বেশী করেই পড়ে। লোকে ভাবে তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রভাবে বেটী তাকে নিজের বশীভূত করে নিজের কথামত কাজ করতে বাধ্য করে।

কিন্তু আসলে তা নয়। জানোয়ারের চোখের দিকে চেয়ে বেটী বুঝতে পারে তার তখনকার মনোভাব। যদি দেখে তার চাউনিটা ঘোরাল হয়ে উঠছে তখন সে বোঝে যে এইবার পশুটা অবাধ্য হবেই, এমন কি আক্রমণ অবধি করতে পারে। তখন সে সাবধান হয়ে যায়।

আমরা দেখেছি দু'চারটে বাঘ সিংহ নিয়ে সার্কাসের খেলোয়াড়কে খেলা দেখাতে। পঞ্চাশ ষাটটা এই ধরনের হিংস্র পশু নিয়ে খাঁচায় ঢুকে খেলা দেখানোর কথা এদেশের সার্কাস খেলোয়াড়রা চিন্তাও করতে পারে না।

কিন্তু ক্লাইড বেটী এ কাজেও পিছপাও নয়। একবার এই রকম খেলা দেখাতে গিয়ে দেখা গেল একটা বাঘকে কতকগুলো সিংহ একসঙ্গে আক্রমণ করেছে। বাঘটা আগে একটা সিংহকে আক্রমণ করাতে এই রকম ঘটনা ঘটে ওঠে। খাঁচায় আরো বাঘ ছিল। তারা তার স্বজাতির সাহায্যে এগিয়ে না এসে যে যার দাঁড়াবার জায়গায় দাঁড়িয়ে অন্য দিকে চেয়ে হাই তুলতে থাকে।

কেন এমনটা হল এ কথা জিজ্ঞেস করায় বেটী বলে, সিংহের মধ্যে যে স্বজাতিপ্রীতি আছে কিন্তু বাঘেদের মধ্যে তা দুর্লভ।

চারটে কুকুর ছিল।

এই বিপদসংকুল কাজে যে কোন সময়ে মানুষ মারা যেতে পারে। তাই বেটী অনেকবার এ কাজ ছেড়ে দেবার মনস্থ করেও পারেনি। তার প্রধান কারণ অন্য কাজে এই রকম উত্তেজনা নেই। বেটী বলে, নিরুদ্বিগ্ন কেরানী-জীবন যাপন করে হাঁপিয়ে মরার চেয়ে এই সব ভয়াবহ কাজে জানোয়ারের মুখে প্রাণ দেওয়াও বেশী আনন্দের।

তাই কোন বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে তার একটুও দেরি হয় না। মনেও হয় না কি ঘটবে এর পর। কিন্তু কি আশ্চর্যের কথা, বিপদে পড়ে উদ্ধার পাবার বুদ্ধি যেন তার আপনি যুগিয়ে যায়।

যে বেটী এতদিন সার্কাসে এই কাজ করে আসছে তার ছেলেবেলার কথা ভাবলে মনে হয় যেন সে এই কাজ করার জন্যেই জন্মেছে।

ছোটবেলা থেকেই তার বাঘ সিংহ খেলাবার শখ। কিন্তু বাঘ সিংহ পাবে কোথায়! তার চারটে কুকুর ছিল। তাদেরই সে খেলা শিখিয়ে বন্ধুদের দেখাত।

যখন তার বয়েস সবে বারো পার হয়েছে হঠাৎ দেখা গেল তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের শহরে একটা সার্কাস পার্টি এসেছিল। সেই দলে অনেক বাঘ সিংহ ছিল। বাঘ সিংহর খাঁচা পরিষ্কার করার চাকরি নিয়ে সে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। বেপরোয়াভাবে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বলে ভবিষ্যতে বাঘ সিংহ খেলানোর আকাঙ্ক্ষা তার মিটে যায়।

বেটীর জীবন দেখে মনে হয় যে মানুষ যা আকাঙ্ক্ষা করে সেটা লাভ করার জন্যে সবকিছু ছেড়ে যদি সে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তাহলে তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবেই।

ছড়া

হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আয়রে আমার পুসি,
চুক চুক চুক দুধ খাবি আয়
যত তোদের খুশি ;
ওমা, ওটা কে—
না না এখন খাওয়াব দুধ
আমার সোনাকে।

আয়রে আমার চড়াই,
লাল টুক টুক নীল টুক টুক
জামা তোদের পরাই ;
ওমা, ওটা কে—
যা তোরা যা, দেব জামা
আমার সোনাকে।

আয়রে আমার টিয়ে,
চুপ চুপ চুপ ঘুম পাড়াব
দোলনাতে দোল দিয়ে ;
ওমা, ওটা কে—
না না না না ঘুম পাড়াব
আমার সোনাকে !

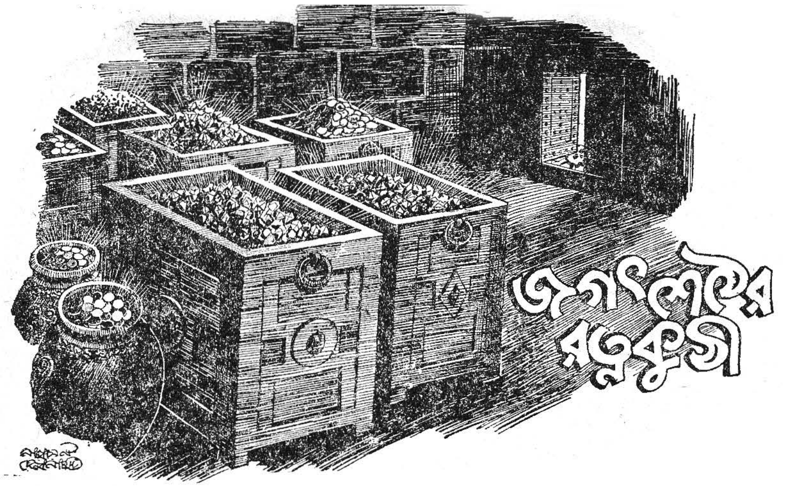

৺হেমেন্দ্রকুমার রায়

[অপ্রকাশিত উপন্যাস]

তৃতীয় অধ্যায়
জগৎশেঠের গুপ্তধন

(পূর্বানুবৃত্তি)

জয়ন্ত বললে, "খাতার দ্বিতীয় অংশ শেষ হ'ল। তৃতীয় অংশ আমাদের হাতে নেই। চতুর্থ অংশের নাম 'ইতিহাস'। এইবারে সেটুকু পাঠ করা যাক।"

আবার পড়া শুরু হ'ল ঃ

"সারা পৃথিবীকে যিনি ঋণদান করতে পারেন, তাঁরই উপযোগী উপাধি হ'চ্ছে 'জগৎশেঠ'। দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ শাহ ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ উপাধি দিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের মহাজন ফতেচাঁদকে।

কিন্তু ফতেচাঁদ মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা হ'লেও বাঙালী ছিলেন না। তাঁর পূর্বপুরুষ হীরানন্দ শাহা সুদূর রাজস্থান থেকে পাটনায় এসে ব্যবসায় শুরু করেন এবং তেজারতী কারবারে প্রভূত সম্পত্তির মালিক হন।

হীরানন্দের সাত ছেলে। তাঁদের একজনের নাম মানিকচাঁদ। তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবার জন্যে বাংলার তখনকার রাজধানী ঢাকায় গিয়ে হাজির হন এবং নবাব-দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। পরে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ পশ্চিমবঙ্গে এসে ভাগীরথীতটে নূতন রাজধানী স্থাপন ক'রে নিজের নামানুসারে তার নাম রাখেন মুর্শিদাবাদ। নবাবের প্রিয়পাত্র মানিকচাঁদও নূতন রাজধানীতে এলেন। নবাব-দরবারে তাঁর প্রভাব ক্রমেই বেড়ে উঠতে থাকে। তাঁর পরামর্শে মুর্শিদাবাদে

নবাবী টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি হন নবাবের অর্থসচিব ও কোষাধ্যক্ষ। ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ তাঁকে 'শেঠ' উপাধি দান করেন।

এই মানিকচাঁদের বংশধররা পরে কেবল নবাব-বংশের নয় স্বাধীন বাংলা-দেশেরও উত্থান ও পতনের অন্যতম কারণরূপে ইতিহাসে অমর হ'য়ে আছেন।

মানিকচাঁদ ছিলেন অপুত্রক। ভ্রাতুষ্পুত্র ফতেচাঁদ হন তাঁর দত্তকপুত্র। তিনি দিল্লীতে থেকে অংশীদাররূপে কারবার দেখতেন। কিন্তু ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মানিক-চাঁদের মৃত্যু হ'লে তিনিও মুর্শিদাবাদে চ'লে আসেন। এর দুই বৎসর পরেই তিনি জগৎশেঠরূপে ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে ধনিক বা পুঁজিপতি ব'লে সুপরিচিত হন।

মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর (১৭২৭ খ্রীঃ) পর সুজাউদ্দীন নবাব হ'য়ে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়টাই হ'চ্ছে জগৎশেঠ ফতেচাঁদের জীবনে সবচেয়ে গৌরব ও সৌভাগ্যের যুগ। তিনি কেবল সুবিপুল ধনাগারের অধিকারী ছিলেন না, নবাব-দরবারে ও দেশ-বিদেশে তাঁর সম্মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তিও ছিল অতুলনীয়। কিন্তু সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সরফরাজ খাঁর সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই জগৎশেঠকে প্রথম ষড়্‌যন্ত্রে যোগ দিতে হ'ল।

তরুণ নবাব সরফরাজ ফতেচাঁদের পুত্রবধূর অসীম রূপলাবণ্যের কথা শুনে নির্বোধের মত তাঁকে স্বচক্ষে দেখবার বাসনা প্রকাশ করলেন,—এটুকু তাঁর খেয়ালে এলো না যে, হিন্দুদের অসূর্যম্পশ্যা কুলললনার পক্ষে সেটা হ'চ্ছে অতিশয় অপমানকর প্রস্তাব!

ফতেচাঁদ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হ'য়ে আলিবর্দী খাঁয়ের সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হলেন এবং তার ফলে গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সরফরাজের মৃত্যু ও ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দীর সিংহাসনপ্রাপ্তি।

এই ঘটনার চার বৎসর পরে ফতেচাঁদ ইহলোক ত্যাগ করলেন। তাঁর দুই পৌত্র—মাধব রায় ও স্বরূপচাঁদ। মাধব রায় জগৎশেঠ উপাধির সঙ্গে বেশীর ভাগ সম্পত্তির অধিকারী হলেন এবং বাকি সম্পত্তির সঙ্গে স্বরূপচাঁদ নবাব-দরবার থেকে পেলেন 'রাজা' উপাধি। বাংলাদেশে তখন ইংরেজ ও ফরাসীরাও প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করছিলেন, সুচতুর জগৎশেঠরা তাঁদেরও লক্ষ লক্ষ টাকা ধার দিয়ে তুষ্ট রাখতে ভুললেন না। এইভাবে সব দিক সামলে ব্যবসা চালিয়ে তাঁরা দিনে দিনে অধিকতর

আর্থিক উন্নতির পথে এগিয়ে চললেন।

তারপরেই আলিবর্দীর মৃত্যু ও ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজের সিংহাসন লাভ এবং তাঁর সঙ্গে জগৎশেঠের বিরোধ। নূতন নবাবের কাছে অপমান ও লাঞ্ছনা লাভ ক'রে জগৎশেঠ আবার মীরজাফর ও ইংরেজদের সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। ফল, পলাশীর যুদ্ধ ও সিরাজের পতন এবং বাংলার সর্বনাশ।

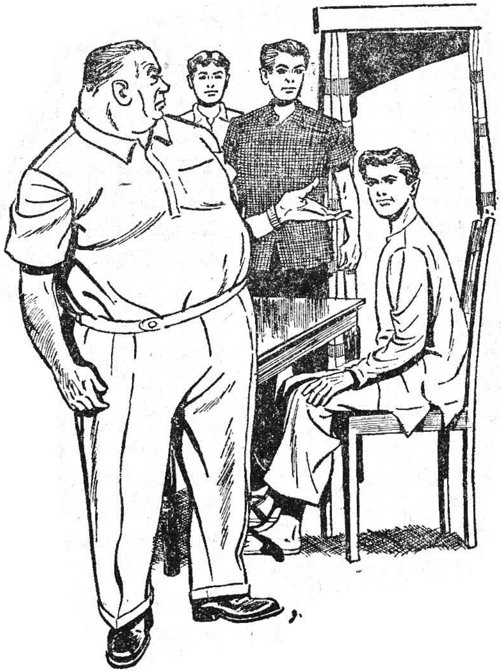

তাঁর ঠাকুরদার গল্প বানানোর অভ্যাস ছিল!" [পৃষ্ঠা ১৭৬

জগৎশেঠেরা আবার পূর্ব-গৌরবের পদে উন্নীত হ'য়ে নিজেদের স্বর্ণভাণ্ডারের পরিধি আরো বাড়িয়ে তুললেন বটে, কিন্তু তখনই ভিতরে ভিতরে তাঁদের উপরে শনির দৃষ্টি পড়তে শুরু হ'ল। তারপর অকর্মণ্য মীরজাফরকে বঞ্চিত ক'রে ইংরেজরা ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যের ভার অর্পণ করলেন মীরকাশিমের হস্তে। নূতন নবাবকে নিয়ে জগৎশেঠেরা সুখী হ'তে পারলেন না, তাঁরা আবার চক্রান্তে যোগ দিলেন। কিন্তু এবারে তাঁরা আর শেষ রক্ষা করতে ও নিয়তিকে ফাঁকি দিতে পারলেন না, বিপদ ক্রমেই ঘনীভূত হ'য়ে উঠছে দেখে মীরকাশিম তাঁদের বন্দী ক'রে ফেললেন (১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে)। তাঁদের বন্ধু ইংরেজদের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁরা আর মুক্তিলাভ করতে পারলেন না।

তারপর উদয়নালার যুদ্ধ; মীরকাশিমের পরাজয় এবং জগৎশেঠ ও অন্যান্য বন্দীদের নিয়ে মীরকাশিমের মুঙ্গেরে প্রস্থান; বক্সারের যুদ্ধ; মীরকাশিমের শেষ পরাজয় (১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে) এবং জগৎশেঠ প্রভৃতিকে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ ক'রে হত্যা।

মীরজাফর আবার বাংলার নবাব হন এবং নূতন জগৎশেঠ কুশলচাঁদও (নিহত জগৎশেঠ মাধব রায়ের বড় ছেলে) আবার ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। তিনিও ইংরেজদের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য লাভ ক'রেও শেঠবংশের পূর্বগরিমা আর ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। বাংলার ভুয়ো নবাবীর সঙ্গে জগৎশেঠদেরও জাঁক-জমক ম্লান হ'য়ে এসেছিল, বাংলার স্বাধীনতাহরণে সাহায্য ক'রে তাঁরাও আত্মরক্ষা করতে পারলেন না।

বুদ্ধিমান কুশলচাঁদ বুঝে নিয়েছিলেন যে, জগৎশেঠদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়—তাঁদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। দুঃসময়ের জন্যে তিনি প্রস্তুত হ'তে লাগলেন।

তাঁর আদেশে একটি গুপ্ত কুঠী নির্মিত হ'ল এবং নিজের সম্পত্তির কতক অংশ তিনি সেইখানে লুকিয়ে রাখলেন।

সেই রত্নকুঠীর কাহিনী আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে, কিন্তু তার ঠিকানা কেউ জানে না। কুশলচাঁদ হঠাৎ মারা পড়েন, তাই গুপ্তধনের সন্ধান নিজের উত্তরাধিকারীর কাছে দিয়ে যেতে পারেন নি।

শেষ পর্যন্ত কুশলচাঁদ যা ভয় করেছিলেন তাইই সত্য হ'য়ে দাঁড়ায়। ক্রমেই শেঠদের অর্থ ও প্রতিপত্তি ক'মে এলেও কুশলচাঁদের মৃত্যুর পর আরো দুইজন জগৎ-শেঠের নাম শোনা যায়—হারেকচাঁদ ও ইন্দ্রচাঁদ।

ইন্দ্রচাঁদের পুত্র গোবিন্দচাঁদ 'জগৎশেঠ' উপাধি থেকেও বঞ্চিত হন এবং পিতার সম্পত্তিও বোকার মত দুই হাতে উড়িয়ে দিয়ে ইংরেজের অন্নদাসরূপে শেষ-জীবন কাটাতে বাধ্য হন। তাঁর পুত্র কৃষ্ণদাসকেও দেশদ্রোহী জগৎশেঠদের কাছে উপকৃত ইংরেজরা বৃত্তি দান করতেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সে বৃত্তিও বন্ধ হয়।

জগৎশেঠের আধুনিক বংশধররাও মুর্শিদাবাদে বাস করেন, কিন্তু লুপ্ত হয়েছে তাঁদের আর্থিক গৌরব। হয়তো তাঁরাও প্রবাদে গুপ্তধনের কাহিনী শ্রবণ করেন, কিন্তু তার সত্যতা নিরূপণ করবার উপায় তাঁদের হাতে নেই—আবিষ্কার করতে পারলে এখন এ গুপ্তধনের মালিক হবে যে কোন ব্যক্তি।"

জয়ন্তের পাঠ সাঙ্গ হ'ল। কিছুক্ষণ নীরবতার পর সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! সব তো শোনা হ'ল! খানিকটা ভণিতা, খানিকটা গালগল্প, খানিকটা গাঁজা-মেশানো ইতিহাস! বীরেনবাবু ঠিকই ধরেছেন—তাঁর ঠাকুরদার গল্প বানানোর অভ্যাস ছিল!"

জয়ন্ত বললে, "উপসংহারে একটি পদ্যও আছে, সেটাও চেঁচিয়ে পড়া যাক !"
ব'লে সে পড়তে লাগল ঃ

বোকায় ধোঁকা দেবার তরে বুদ্ধিসাগর মন্থি'
গোলকধাঁধার গ্রন্থ রচি আমি নতুন গ্রন্থী।
কিন্তু আমি ঠিক জানি ভাই,
গুপ্তপথে রপ্ত সবাই !
সর্বজনের সামনে লুকোয় সহজ পথের পন্থী।

* *

বিন্দু বারি সিন্ধু হ'লে যায় না দেখা বিন্দুকে,
ইন্দু আছে মেঘের আড়ে, নিন্দে তবু নিন্দুকে।
মানসনয়ন যে খুলে চায়
সত্য মানিক সেই খুঁজে পায়,
মূর্খ শুধু রত্ন খোঁজে মস্ত লোহার সিন্দুকে !

সুন্দরবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, "এ যে বাবা দস্তুরমত হেঁয়ালি !"

বীরেন বললে, "প্রায় অতি-আধুনিক কবিতার মত !"

মানিক বললে, "খাপছাড়া পদ্য-টদ্য নিয়ে আপাতত মাথা ঘামাবার দরকার নেই। জয়ন্ত, তুমি কি মনে কর, বীরেন-বাবুর দেশের বাড়িতে যে রহস্যময় ঘটনা ঘটেছে, তার সঙ্গে এই খাতার লেখার কোন সম্পর্ক আছে ?"

জয়ন্ত বললে, "এইবারে তাই নিয়েই আলোচনা করতে হবে।"

মধু একখানা খাম হাতে ক'রে ঘরে ঢুকে বললে, "বাবু, একটা অদ্ভুত লোক এসে আপনার নামে এই চিঠিখানা দিয়ে গেল।"

—"অদ্ভুত লোক ?"

এই চিঠিখানা দিয়ে গেল।"

—"হ্যাঁ বাবু। পরনে সন্ন্যাসীর মত গেরুয়া কাপড়, মাথায় জটা, একমুখ দাড়িগোঁফ।"

জয়ন্ত খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা প'ড়েই লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "কোথায় সে ?"

—"বাবু, চিঠিখানা আমার হাতে গুঁজে দিয়েই সে হনহন ক'রে চ'লে গেল !"

চিঠিতে কেবল লেখা ছিল, "সাবধান, সাবধান,—সাক্ষাৎ-শয়তান প্রতাপ চৌধুরীকে সাবধান !"

(ক্রমশঃ)

কোন জিনিসের গন্ধ আছে, কোন জিনিসের গন্ধ নেই কেন ?

ফুলের দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় মুখ দিয়ে আপনিই একটা কথা বেরিয়ে পড়ে। বলি, বাঃ, কি সুন্দর গন্ধ ! যতটা পারি প্রশ্বাসটা টেনে নিই নাক দিয়ে যাতে গন্ধটা অনেকক্ষণ ধরে শুঁকতে পাই।

অথচ পচা মাছ বা নর্দমার কাছ দিয়ে যাবার সময়ে মুখ সিঁটকে বলি, উঁঃ, কি বদ গন্ধ রে বাবা ! প্রশ্বাস নেওয়া বন্ধ করে নাকে চাপা দিয়ে সে স্থান দ্রুত ত্যাগ করি।

আবার এমন জিনিসও আছে যা থেকে ভাল মন্দ কোন গন্ধই পাই না।

কেমন এমন হয় বলতে পার ?

প্রথমে বুঝতে হবে আমরা গন্ধ পাই কি করে। আমাদের নাকের মধ্যে এমন কতকগুলি স্নায়ু আছে যাতে কোন বস্তুর সংস্পর্শ হলে আমরা গন্ধ পাই। দ্বিতীয়তঃ, সব দ্রব্যের মধ্যেই অণু আছে। সেই অণুর সূক্ষ্মতম বস্তু, আমাদের শাস্ত্রে বলে তন্মাত্র, সেগুলি সেই দ্রব্য থেকে সব সময়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এই সূক্ষ্মতম বস্তুগুলি নাকের স্নায়ুর সংস্পর্শে এলে স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে ওঠে আর আমরা গন্ধ পাই।

কোন কোন বস্তুর নাকের স্নায়ু উত্তেজিত করার শক্তি নেই। যেমন—জল, বাতাস ইত্যাদি। এইগুলির সূক্ষ্ম বস্তুগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেও নাকের স্নায়ু উত্তেজিত করতে পারে না বলে আমরা গন্ধ পাই না।

গল্প নয়, সত্য

কুমারী তপনী ঘোষাল

আজ হতে প্রায় ছ'সাত বছর আগেকার কথা। আমার বয়স হবে সাত কি আট। আমরা তখন থাকি শান্তিনিকেতনে এবং আমি তখন ওখানকারই পাঠভবনের ছাত্রী। আমার বাবা বিশ্বভারতীর অধ্যাপক। আমাদের বাড়িটা ছিল আশ্রমের এলাকার মধ্যেই। আশ্রমের উত্তর প্রান্তে আমাদের বাড়িটাই শেষ বাড়ি—এর পরেই বিশাল মাঠ। আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র তিনশ গজ দূরে একটা ছোট্ট নদী। বর্ষাকালে সেটা হত জলে জলময় কিন্তু শীতকালে তাতে মাত্র হাঁটুভর জল থাকত।

শীতকালের এক অপরাহ্ণ। আমি একা একা সেই মাঠের মধ্যে বুনো কুল খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ পেছনে পায়ে চলার শব্দ কানে এল। চমকে উঠে পেছন ফিরে দেখি আমাদেরই নতুন ঝি মতি হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মতির চেহারা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। সবল সুস্থ তার দেহ। সে আমাদের বাড়িতে রোজ দিনের বেলায় কাজ করে বিকেলের দিকে নদীর ওপারে তার গ্রামে চলে যায়। মতিকে দেখে মনে হল ও আমার চেয়ে বড়। হাত বাড়িয়ে উঁচু ডাল থেকে কুল পাড়তে পারবে। ওকে যখন দু'চারটে কুল পেড়ে দেবার কথা বলব ভাবছি, মতি হঠাৎ বলে উঠল, "খুকুদিদি, বাড়িতে কারা সব এসেছে, তাই তোমার গলার সোনার হারটা মা একবার দেখতে চাইছেন।"

যদিও সেই বয়সে আমি সংসার সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না তবুও আমার মনে কি জানি কেন একটা সন্দেহ উপস্থিত হল এবং আমি ইতস্ততঃ করতে লাগলাম। মতি তাড়া দিতে লাগল হারটা তখুনি দিয়ে দেবার জন্যে। মতির পীড়াপীড়ি এড়াতে

না পেরে শেষ অবধি আমি হারটা তাকে খুলেই দিলাম। মতি হারটা নিয়ে বাড়ির দিকে না গিয়ে নদীর-দিকে পা বাড়াল। তখনি আমার সন্দেহ আবার জেগে উঠল, আমি সঙ্গে সঙ্গে তার পেছনে পেছনে গেলাম চেঁচাতে চেঁচাতে—"হারটা দাও না, এই, দিয়ে দাও, ভাল হবে না বলছি !"

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা ! মতি আমার কথা কানে তো নিলেই না বরং আরও জোরে জোরে পা চালাতে শুরু করল। মতি জোরে হাঁটছে আর আমি তার পেছনে ছুটছি। এইভাবে আমরা দুজনেই নদীটার ধারে এসে পড়লাম এবং মতি চটপট ওটা পার হবার যোগাড় করতে লাগল। আর কোন উপায় না দেখে আমি তখন মরিয়া হয়ে তার শাড়ি ধরে কাঁদ-কাঁদ মুখে বলতে লাগলুম, "হারটা দিয়ে দাও, হারটা দিয়ে দাও।" কিন্তু মতি এবারও আমার কথায় কান দিল না। আঁচল ধরে টানছি দেখে সে আমাকে তার গ্রামে নিয়ে যাবার জন্য অনেক রকম লোভ দেখাতে লাগল। মতির রকমসকম দেখে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। এখন যে কি করা উচিত তা আমার মাথাতে এল না।

ঠিক এই সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। আমাদের প্রতিবেশী অমলবাবুর একটি বিরাট অ্যালসেসিয়ান কুকুর ছিল। তাকে আমরা সকলে খুব আদর করতাম। যখন মতির সঙ্গে হার নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া চলছে, এমন সময়ে অমলবাবুর কুকুরের ডাক কানে এল। কুকুরটা তার স্বজাতিসুলভ গম্ভীরকণ্ঠে ডাকছে ভৌ ভৌ করে। সেই শব্দ বাতাসে ভেসে আমার কানে আসতে কে যেন আমার অজ্ঞাতে আমারই কণ্ঠ দিয়ে বার করে দিলে—"পিকেট ! পিকেট !"

পরমুহূর্তেই অমলবাবুর কুকুর পিকেট হাঁপাতে হাঁপাতে এসে কোনরকম দ্বিধা না করে একেবারে মতির ওপর লাফিয়ে পড়ল।

এইবার কাঁদবার পালা এল, আমার নয়, মতির। আমি তার আর্তনাদ শুনতে পেলাম—"আমাকে বাঁচাও খুকুদিদি, বাঁচাও !" আমিও সুযোগ পেয়ে বলে উঠলাম, "আমার হারটা ফিরিয়ে দাও শীগ্‌গির।"

মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে পার আছে কিন্তু কুকুরের কাছে চালাকি চলে না। পিকেট এর মধ্যেই তার শাড়ি ভীষণভাবে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছিল। প্রাণের ভয়ে মতি হারটা ফেরত দিতে পারলে যেন বাঁচে। চাইতেই সঙ্গে সঙ্গে

মতির ওপর লাফিয়ে পড়ল। [পৃষ্ঠা ১৮০

ফিরিয়ে দিলে। আমি ওটা হাতে নিয়েই কুকুরকে ডাক দিলাম—"পিকেট, পিকু পিকু, এ দিকে আয়।" পিকেট তখনি মতিকে ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে খুশির সঙ্গে ল্যাজ নাড়তে লাগল। পিকেটকে যে তখন কত ভাল লাগছিল সে কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে আমি তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম।

এবার মতির দিকে তাকিয়ে দেখি সে এর মধ্যেই নদীটা পার হয়ে একবারও পেছনে না তাকিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে হেঁটে যাচ্ছে, দেখলে মনে হবে যেন দৌড়ে পালাচ্ছে। আমি তখন হারটা নিয়ে আমাদের বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলাম। পিকেটও পেছনে পেছনে দৌড়োতে লাগল।

আজ থেকে ছ'সাত বছর আগে এই অদ্ভুত ঘটনাটা আমার জীবনে ঘটেছিল। আজও যখন সে কথা মনে পড়ে, এক এক সময়ে মনে হয়, পিকেট যদি তখন না আসতো··· !

চশমা

ডাক্তার—আপনি কিন্তু আপনার চশমাটা সব সময় চোখে দিয়ে রাখবেন।

রুগী—ঘুমোবার সময়ও ?

ডাক্তার—ঘুমোবার সময় কি দেখতে পান ?

রুগী—কেন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি রোজ স্বপ্ন দেখি যে !

—কুমারী তৃপ্তি গাঙ্গুলী

চোরেরা চুরি করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

শব্দ হলেও যায় না শোনা

রাধাশ্যাম দাশ

একবার আমেরিকায় এক স্বর্ণালংকারের দোকানে বেশ বড় রকম চুরি হয়ে গেল। দোকানটি সবরকম বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে সুরক্ষিত করা ছিল। তবুও চোরেরা সাবধানে চুরি করে দেওয়াল কেটে বেরিয়ে যায়। কেউই কিছু করতে পারে না। তখন দোকানটিতে অতিশাব্দিক তরঙ্গ বিকিরণ করে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা হলো। চোরেরা আগের মতই আবার দেওয়াল কেটে চুরি করতে যেই ঢুকলো—ব্যস্, অমনি অতিশাব্দিক তরঙ্গের সাহায্যে বৈদ্যুতিক সংযোগ হয়ে গেল আর ভীষণ শব্দে সব ঘণ্টাগুলি বাজতে লাগলো। চোরেরা সব ধরা পড়লো। অবশ্য বিচারের সময় চোরেরা বললো যে তাদের জানা সবরকম আপদ-বিপদের জন্য তারা তৈরী ছিল কিন্তু অতিশাব্দিক তরঙ্গের সাহায্য নিয়ে তাদের ধরা খুবই অন্যায় হয়েছে। ওদের কথা বিচারকরা কানে নেননি।

এই অতিশাব্দিক তরঙ্গ কাকে বলে জানো কি ?

তোমরা হয়তো জানো যে বাতাসের ঢেউ আমাদের কানের পর্দায় এক বিশেষ অনুভূতি জাগায় তাই আমরা শুনতে পাই। কিন্তু এমন শব্দও আছে যা আমরা শুনতে পাই না—একথা জানো কি ?

কথা বললে বায়ুস্তরে ঢেউএর সৃষ্টি হয়। ঐ বায়ুর ঢেউকে বলে কম্পন। যখন বায়ুস্তরের কম্পন-সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে ১৬,০০০ থেকে ২০,০০০এর বেশী হয় তখন আর আমরা কেবলমাত্র কান দিয়ে শুনতে পাই না। ঐ রকম ১৬,০০০ বা তারও বেশী কম্পন-সংখ্যাযুক্ত শব্দতরঙ্গকে অতিশাব্দিক তরঙ্গ (supersonic wave) বলে।

বিজ্ঞানীরা ঐরকম অতিশাব্দিক তরঙ্গের খোঁজ পাবার পর নানাভাবে একে কাজে লাগাতে উঠে পড়ে লেগেছেন। আজকাল ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর কিছু কিছু সার্থক প্রয়োগও হচ্ছে।

মানুষের চেয়ে কুকুরদের এই অতিশাব্দিক তরঙ্গ শোনার কিছু বেশী ক্ষমতা আছে। আগের দিনে পাশ্চাত্য দেশে বিচারে অভিযুক্ত লোক দণ্ডাদেশের ভয়ে বনে পালিয়ে যেত। তার সঙ্গে থাকতো এক বিশেষ ধরনের বাঁশি, এবং সে বাঁশি দিয়ে যে অতিশাব্দিক তরঙ্গ উৎপন্ন করতো তা কেবলমাত্র তার পোষা কুকুরটিই শুনতে পেতো, অন্য কোন মানুষের সে প্রচণ্ড শব্দতরঙ্গ শোনার ক্ষমতা থাকতো না। এই বাঁশির নাম ছিল Poucher s'Whistle. আজকালও খুব সহজে ঐ ধরনের এক বাঁশি তৈরি করে গবেষণাগারে অতিশাব্দিক তরঙ্গ উৎপন্ন করার ব্যবস্থা আছে। এরকম বাঁশির শব্দ-তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যা হয় সেকেণ্ডে ৯০,০০০। এ ধরনের বাঁশির নাম Galton's Whistle.

'পাইজোইলেকট্রিক প্রোজেক্টার' নামে এক বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে যার সাহায্যে অতিশাব্দিক তরঙ্গ উৎপন্ন করা হচ্ছে। দেখা গেল যে অতিশাব্দিক তরঙ্গকে যদি একটি বিশেষ বিন্দুতে উৎপন্ন করা হয় তবে তার ক্ষমতা কল্পনাতীত হয়। যদি ট্রেনের হুইস্‌লের শব্দকে একক ধরা যায় তবে তার হাজার লক্ষগুণ ক্ষমতাশালী প্রচণ্ড শব্দতরঙ্গ ঐ বিন্দুতে উৎপন্ন হবে। কোন তরল পদার্থের মাঝে যদি ঐ শব্দতরঙ্গ উৎপন্ন করা যায় তবে ঐ তরল পদার্থের মাঝে একটি তীব্র ফোয়ারার সৃষ্টি হবে।

যদি কেউ এমন চান যে সেই "সিসেম খোল" কথা বলার মত ব্যবস্থা করতে হবে তবে তা ঐ অতিশাব্দিক তরঙ্গের সাহায্যে করা সম্ভব। ঐ লোকটির মোটর গাড়িতে এমন এক বিশেষ অতিশাব্দিক তরঙ্গ উৎপন্ন করার ব্যবস্থা থাকবে যার ফলে কেবলমাত্র তাঁর গাড়িই ফটকের কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে আপনা হতেই ফটক খুলে যাবে; অন্য কারও গাড়ি এলে ফটক খুলবে না। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে যে বাদুড় রাত্রে আহার্য খোঁজার সময় ঐরূপ এক অতিশাব্দিক তরঙ্গ উৎপন্ন করে এবং কোন পতঙ্গ ইত্যাদিতে সেই শব্দতরঙ্গ প্রতিফলিত হলে তা বুঝতেও পারে, আর এইভাবেই সে রাত্রের শিকার সংগ্রহ করে।

জাহাজের নীচে 'হাইড্রোফোন' নামে আজকাল একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এটিও অতিশাব্দিক তরঙ্গ উৎক্ষেপণের এক বিশেষ যন্ত্র মাত্র। এর সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা এবং তলদেশে কোথায় পর্বত ইত্যাদি আছে জানা সম্ভব। এমন কি মাছ ধরার কাজেও এ যন্ত্রটাকে ব্যবহার করা যাচ্ছে। এর সাহায্যে সমুদ্রের তলদেশে চারদিকে শব্দতরঙ্গ পাঠিয়ে কোথায় মাছের ঝাঁক আছে এবং তা কত বড় ইত্যাদিও জানা সম্ভব হচ্ছে।

গবেষণাগারে একটি পাত্রে কিছু জীবন্ত মাছের উপর এই অতিশাব্দিক তরঙ্গের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করার সময় দেখা গেছে যে অতিশাব্দিক তরঙ্গ উৎপন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গেই মাছেরা স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা বন্ধ করে হঠাৎ জলের উপর ভেসে ওঠে ও স্থির হয়ে থাকে। যদি শব্দতরঙ্গকে আরও শক্তিশালী করা যায় তবে সবগুলি মাছই মরে যাবে। এই পরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা ঠিক করলেন যে হয়তো এই অতিশাব্দিক তরঙ্গ দ্বারা রোগবীজাণু ধ্বংস করাও সম্ভব। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেল যে যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া ইত্যাদি কয়েকটি রোগ উৎপাদনকারী বীজাণু অতিশাব্দিক তরঙ্গের সাহায্যে (৭০০০,০০০ কম্পন প্রতি সেকেণ্ডে) কয়েক মিনিটেই বেশী ভাগ ধ্বংস হয়।

এ বিষয়ে নিত্য নূতন আবিষ্কার হচ্ছে। এই অদ্ভুত শব্দতরঙ্গের কথা আবার সময় পেলে তোমাদের বলবো।

গণনার জাদুকর

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

আমেরিকা। গুণীজনের সভা। সামনের ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা হল একশ'টি সংখ্যা। তার নীচেও লেখা হল একশ'টি সংখ্যা।

সভাপতি বললেন, "এবার গুণ করুন।"

মুখে মুখে গুণ করে গুণফল বলে গেলেন একজন। গুণ করতে তাঁর লাগল মাত্র আধ ঘণ্টা। গুণফলটা বোর্ডে লিখে রাখলেন সভাপতি মশাই।

তারপর লম্বা লম্বা কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে বসে গেলেন গুণীজনেরা গুণ করতে। যিনি সব চাইতে তাড়াতাড়ি গুণ করলেন তাঁর লাগল আড়াই ঘণ্টা। দু'তিনজন গুণ করে গুণফলটা পরস্পরে মিলিয়ে নিলেন। তারপর বোর্ডে লেখা গুণফলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন তাঁরা। একেবারে নির্ভুল।

আমেরিকার লোকেরা তো অবাক। সভাপতি মশাই বড়গলায় বললেন, "আজ আমরা গণনার জাদুকরের দেখা পেলাম। কোনদিন কল্পনাও করিনি কেউ মুখে মুখে একশ' সংখ্যাকে একশ' সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে পারে।"

জানো কে এই গণনার জাদুকর?

—সোমেশচন্দ্র বসু।

ঢাকা জেলায় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মেছিলেন সোমেশচন্দ্র। ছেলেবেলা থেকেই ইনি মুখে মুখে অঙ্কের উত্তর বলে দিতে পারতেন। শেষ বয়সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যখন, তখনও কোন পরীক্ষা হলেই তার অঙ্কের প্রশ্নপত্র পড়ে শোনাতে বলতেন। আর শোনার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরগুলো মুখে মুখেই বলে দিতেন।

বার গণনাতেও এঁর অদ্ভুত কৃতিত্ব ছিল। 'অমুক সালের অমুক তারিখে কি বার ছিল'—এ প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বারের নাম বলে দিতেন।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় এই গণিত-জাদুকরের মৃত্যু হয়।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

(এর পর ২১৩ পৃষ্ঠায়)

"৺প্রিয়কান্তি ভাদুড়ী স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য় দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

চ্যালেঞ্জ

শ্রীনির্ধনচন্দ্র সর্দার

জ্ঞান ফিরল দুঃখীর। দৃষ্টিতে একরাশ বিস্ময় ঢেলে চারিদিকে তাকিয়ে নিল। একি! এত লোকজন কেন! এত গোলমালই বা কিসের জন্য! মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তি কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। গোলমালের মধ্য হতে সহসা বেরিয়ে এল নীতিশের মায়ের কণ্ঠস্বর: "এইজন্যই তো দুঃখীর মাকে বারণ করেছিলুম দুঃখীকে এত পড়াতে। এখন মজা দেখুক।" ষড়যন্ত্রকারিণীদের ভিন্ন কণ্ঠ তৎক্ষণাৎ তৎপর হয়ে উঠল: "আমার তো মনে হয় রাতদুপুরে পড়ে পড়ে ওর মাথার ঠিক নেই। নাহলে এই প্রখর রোদে একা একা বই নিয়ে···"

এবার স্মৃতিদেবী তাঁর মন্দিরদ্বার খুললেন। একে একে সব কথা মনে পড়ল দুঃখীর। সে গিয়েছিল কলেজ স্ট্রীটে পুরানো বইয়ের সন্ধানে। বইও পেল সস্তা দরে। কিন্তু দাম দিতে গিয়ে দেখল তার গাড়িভাড়া মোটেই থাকছে না। তাই বলে এমন সস্তায় পাওয়া বইটা ছাড়তেও রাজী নয় দুঃখী। তাই হাঁটতে শুরু করল সে বাড়ির দিকে—বারো তের মাইল দূরে হাওড়ার এক গ্রামে। সকাল থেকে খাওয়া হয়নি বিশেষ কিছু। চার পয়সার মুড়ি উদরের কোন্ অতল তলে তলিয়ে গেছে। তার উপর প্রচণ্ড রোদ। অর্ধেক পথ সবে এসেছে এমন সময় মাথা ঘুরে উঠল দুঃখীর, কে যেন আঁধারের ধূলি মুঠায় মুঠায় উড়িয়ে দিচ্ছে তার চতুর্দিকে। বসে পড়ল দুঃখী। একটু সামলে নিয়ে আবার রওনা হল। পা কিন্তু চলতে চায় না। কেমন করে সে যে বাড়িতে এসে পৌছল তা সে নিজেই জানে না। তারপর দাওয়াতে বসতেই অবসন্ন হয়ে পড়ল তার দেহ, সঙ্গে সঙ্গে দেহের সমস্ত স্নায়ু আরম্ভ করল ধর্মঘট—এত কাজ করতে তারা রাজী নয়, তাদের মন তো আর দুঃখীর মন দিয়ে গড়া নয়।

জ্ঞান ফিরতে দুঃখী দেখলে মা তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলছেন, "দুঃখী, এত কষ্ট করে তোকে আর পড়তে হবে না। দেবতা আমাদের প্রতি বিরূপ রে···"

চমকে ওঠে দুঃখী। মনে পড়ে হেডমাস্টারের তিরস্কার। প্রথম হতে না পারার জন্য দুঃখীকে তিনি আর বিনা বেতনে পড়তে দেবেন না। স্কুল হতে দেয় সমস্ত সাহায্যের দ্বার আজ রুদ্ধ। কেউই বুঝল না যে দারিদ্র্যই তার অবনতির একমাত্র কারণ। সেই দিনই বিদায়কালে হেডমাস্টারের পা ছুঁয়ে মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল—রেজাল্ট সে ভাল করবেই, এমন ভাল করবে যাতে সকলে

মনে পড়ে হেডমাস্টারের তিরস্কার। [পৃষ্ঠা ১৮৮

চমকে ওঠে। তাই মায়ের গলা জড়িয়ে কাতরকণ্ঠে বলে· দুঃখী, "মা, একথা তুমি বলো না। আশীর্বাদ কর যাতে জ্ঞানসাধনা করতে করতেই আমার মৃত্যু হয়।"

এই প্রতিজ্ঞা, হেডমাস্টারের এই তিরস্কারই বার বার তার ঝিমিয়ে পড়া উৎসাহে, বেদনাহত হতাশায় আশার ইন্ধন যোগাচ্ছে। এমনও দিন এসেছে যখন সারাদিনের উপবাসের বা স্বল্পাহারের ফলে মস্তিষ্ক ঝিমিয়ে এসেছে—পড়া বুঝতে কষ্ট হয়েছে, মুখস্থ করতে দেরি হয়েছে। তখন দুঃখে এবং বিরক্তিতে ভরে উঠেছে তার মন, বিদ্যাসাগরের ছবির কাছে মাথা নত করে প্রার্থনা

করেছে : "হে দয়ার সাগর, তোমার দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি আমাতে সঞ্চারিত কর, আমাকে টেনে নাও তোমার আদর্শ পথে।"

দুঃখীর দুঃখ কিন্তু এখানেই শেষ নয়। জন্মলগ্নে তার নামের সঙ্গে জীবনেও নেমে এসেছে যে অভিশাপ তা সহজেই দূর হতে চাইল না। দুঃখীর দুঃখ তখনই চরমে উঠল যখন তার মায়ের চাকুরিটা গেল। গ্রামের এক ধনীর বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতেন দুঃখীর মা। অভাব-অনটনে দিনের পর দিন উপবাসের ফলে ক্রমেই তিনি দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। তাই কাজ তিনি ভালভাবে করতে পারতেন না। সুতরাং কয়েকদিন যাবৎই রায় গিন্নী তাঁর প্রতি বিরূপ ছিলেন। তার উপর সেদিন জলভরতি ঘড়া নিয়ে উপরে উঠতে গিয়ে পড়ে যান দুঃখীর মা, ভেঙে যায় ঘড়া, ভেঙে যায় তাঁর কপালও, চাকুরিতে হয় জবাব।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে দুঃখী। নিজেকে সে গভীর সমুদ্রে ভাসমান হতভাগ্যের সঙ্গে তুলনা করে। হতাশার শক্ত মুঠি মোচড় দেয় তার মনকে। বৃহত্তর ভবিষ্যতের কালিমালেপিত দৃশ্যগুলি একে একে ভেসে ওঠে তার মানসপটে ; অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলতে থাকে তার মন। মনে পড়ে হেড-মাস্টারের কথা—জীবনে সে কিছুই করতে পারবে না। সত্যই সে কিছু করতে পারল না। কারণ দেখবে না কেউ, দেখবে শুধু পরিণাম। লোকে বলবে দুঃখী ছেলেটা উৎসন্নে গেল। অপরপক্ষে, রায়বাবুদের দিলীপ লোকের খুব প্রশংসা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তিনবার ফেল করবার পর এবার নাকি তার সুমতি হয়েছে—এবারে পাস করে কলেজে ঢুকেছে। ক্ষতে নুন দেওয়া সমাজের এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতিই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চাইল তার মন, পালন করতে চাইল তার প্রতিজ্ঞা। কিন্তু কি করে সে তা সফল করবে ? পায়ের নীচের মাটি যখন ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে তখন সে কি করে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করবে যে সে উৎসন্নে যায়নি ?

সহসা মনে পড়ে এক বুদ্ধি। আর তার পরদিনই সে বসে পড়ে হাওড়া স্টেশনের সামনের ফুটপাথে—জুতা পালিশের কাজে।

* * *

হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়িটার কাঁটাদুটি পুনর্জন্মের পূর্বমুহূর্তে মিলছে। তবুও দুঃখীর তাগাদা নেই। স্কুলে দেরি হবার ভয়ে রাতদিন তাকে ছুটোছুটি করতে হয়েছে। আজ কিন্তু স্কুল নেই। ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। তাছাড়া আজকের আকাশ মেঘলা, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। তাই এখনও পর্যন্ত বেশী খদ্দেরও জোটেনি।

এমন সময় দুই বন্ধু জুতা পালিশ করতে এল। তারা দুজনে স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষার ফল নিয়ে আলোচনা করছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল, "জানিস, এ বছরে কলকাতার স্কুল হেরে গেল মফস্বলের এক স্কুলের কাছে। মফস্বলের এক স্কুলের দুঃখহরণ ঘোষাল নামে এক ছেলে এবারে ফার্স্ট হয়েছে।"

চমকে উঠল দুঃখী। পালিশ করা বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করল ছেলেটিকে, "কি বললেন, দুঃখহরণ ফার্স্ট হয়েছে?"

ছেলেটি উত্তর দিল, "হ্যাঁ, তাতে তোর কি? নে তাড়াতাড়ি করে নে, আবার বৃষ্টি নামবে।"

অত্যুৎসাহে দুঃখী কিন্তু আর একটুও কাজ করতে পারল না। ছুটে গিয়ে সে দেখে এল একটি খবরের কাগজ। সত্যই সে ফার্স্ট হয়েছে। আনন্দে কাঁপতে থাকে দুঃখীর পা, মুখ থেকে কথা সরে না। জীবনযুদ্ধে আজ সে জয়ী। মনে পড়ে হেডমাস্টারের তিরস্কার—সেটাই আজ তাকে এই গৌরব এনে দিলে। দুঃখীর মনে হয় এখনই ছুটে যায় হেডমাস্টারের কাছে, অস্ফুটে ঘোষণা করে গরীবের ছেলেরা স্বেচ্ছায় উৎসন্নে যায় না, দৈন্য-দানবের দ্বারা নিষ্পেষিত না হলে ধনীর দুলালের সমতালে কিংবা দ্রুততর তালে তারাও চলতে পারে।

পরক্ষণেই মনে পড়ে মায়ের কথা—যাঁর প্রতিটি রক্তবিন্দু আজকের এই দিনটির জন্যই সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে দশ মাইল দূরের সেই কুঁড়েঘরে। চোখের সামনে ভেসে উঠল মায়ের সেই জলভরা চোখদুটি; ভেসে এল মায়ের সেই কাতর কণ্ঠস্বর: "তোর এত কষ্ট দেখবার আগে ভগবান্ কেন আমাকে তুলে নিলেন না!"

চঞ্চল হয়ে উঠল দুঃখীর মন। অস্ফুটে বলে উঠল, "মা, আমি যাচ্ছি। চোখের জলে আজ আর আমাকে ডেকো না।" দুঃখী ছুটে মিশে গেল জনতার মাঝে—বাস রুটের দিকে। বন্ধুযুগল অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

গত মাসের বুদ্ধির খেলার উত্তর

দেখ কে কি করছে—

অরণ্য-পর্ব

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বনে সেবার ভয়ানক প্লেগের উৎপাত! বাঘ ভাল্লুক হাতী গণ্ডার সিংহ থেকে শেয়াল খরগোশ কাঠবেড়ালীটি পর্যন্ত—এ রোগে কারো ছাড়ান নেই। কী যে রোগ—আগে কিছু বোঝবার উপায় নেই। খেয়েদেয়ে বাঘ হাই তুলছে, হঠাৎ তার হার্ট গেল ফেল হয়ে! সিংহ রাগে একটা গর্জন তুলেছে, অমনি কাৎ! গণ্ডার ঢুঁ মারবে বলে রুখে দাঁড়িয়েছে—তা কোথায় ঢুঁ—ধপ্ করে পড়লো পাঁকের উপরে—মরে কাঠ!

যে সব জানোয়ার বস্তি ছিল বনে, তাদের চক্ষুস্থির। মরা জানোয়ারের স্তূপ যা জমতে লাগলো তাতে একরাশ পাহাড় উঠলো ঠেলে। এসব মরা জানোয়ারদের কে বা দাহ করে, কে বা দেয় কবর! গলা-পচা দেহের দুর্গন্ধে বন থেকে কাক-চিল-গুলো উড়ে পালিয়ে গেল। শকুনির দলও দারুণ লোভে ছুটে এসে সে গন্ধের চোটে নাক তুলে দে দৌড়।

প্লেগের দাপটে জানোয়ারমহল নির্জীব। হিংসা-দ্বেষ সকলে গেল ভুলে। ছাগলছানা, ভেড়ার ছানা আতঙ্কে চুপচাপ বসে আছে, দূর থেকে সিংহ-ব্যাঘ্রের দল দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে। অতবড় ছ্যাঁচড়া যে নেকড়ে বাঘ, সেও চুপ করে ঝোপের ধারে বসে আছে, সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে হরিণ, মোষ, গরু—ভুলেও তাদের মারবার কথা নেকড়ের মনে জাগে না। একটা কাক একদিন বনের এ-দশা দেখে পাখিদের সভায় গিয়ে তামাশা করে বললে,—বনের জানোয়ারেরা সব বৌদ্ধ হয়ে গেল হে··· হিংসা ভুলে গেছে! পাখিরা একথা শুনে খিকখিক করে হেসে উঠলো।

কিন্তু পাখির দলে আমোদ-আহ্লাদ দেখা দিলেও বনে জানোয়ারদের মন আতঙ্কে আকুল। এমনি করে মড়কে যদি সব যায়, তাহলে এ বনে বাতি দেবে কে? শেয়াল পণ্ডিত বললে,—উপায় নির্ধারণ কর।

সিংহ হলো পশুদের রাজা। নিশ্বাস ফেলে সিংহ বললে,—ঢ্যাঁড়া দাও···সভা ডাকো···বিরাট জানোয়ার সভা···সাপ ব্যাঙ টিকটিকি গিরগিটি পর্যন্ত সবাই যেন

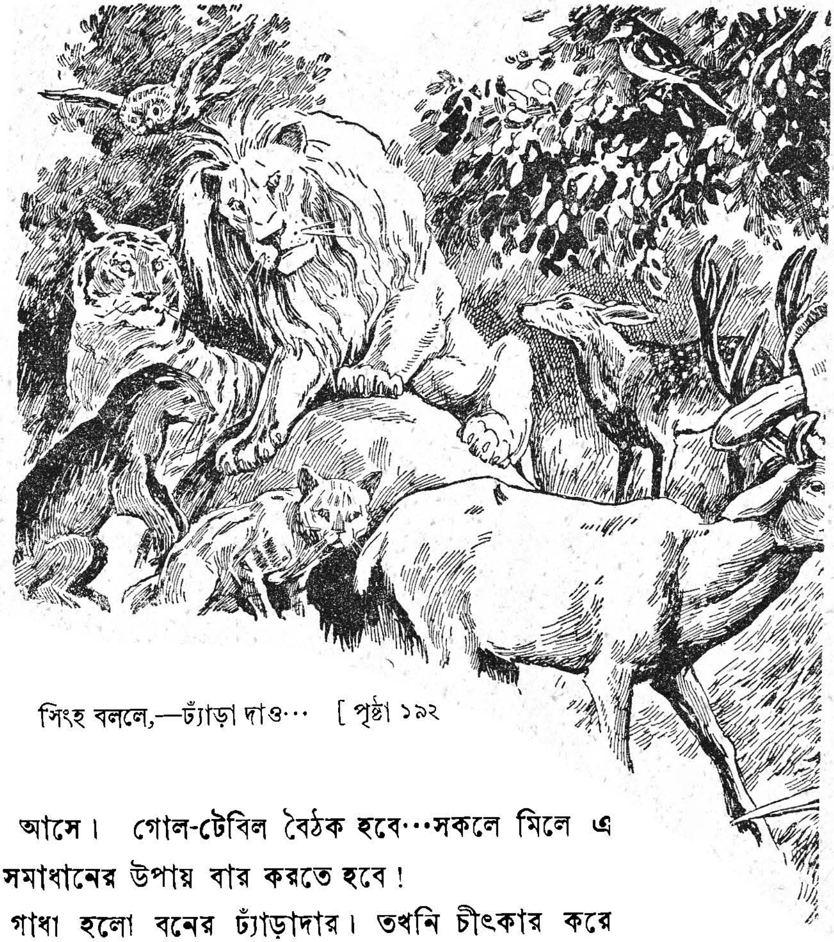

সিংহ বললে,—ট্যাঁড়া দাও··· [পৃষ্ঠা ১৯২

সভায় আসে। গোল-টেবিল বৈঠক হবে···সকলে মিলে এ সমস্যা সমাধানের উপায় বার করতে হবে!

গাধা হলো বনের ট্যাঁড়াদার। তখনি চীৎকার করে সে জানিয়ে দিলে পশুরাজের বিবর-প্রাসাদের সামনে যে খোলা মাঠ, সেই মাঠে হবে বিরাট জানোয়ার সভা···যে যেখানে বেঁচে আছ, সভায় এসে হাজির হবে!

বেলা পাঁচটায় সভা···পাঁচটার একটু আগে বিরাট মাঠটা জন্তুজানোয়ারের ভিড়ে গিসগিস করতে লাগলো। কারো মুখে রা নেই···চুপচাপ এ ওর পানে তাকায়। ফ্যালফেলে করুণ দৃষ্টি সকলের চোখে; মুখ খুলতে কারো সাহস হয় না···কে জানে কি এ নাম-না-জানা বেয়াড়া জাতের প্লেগ—মুখে আওয়াজ বার করবার সময় প্রাণটুকুও যদি সোঁ করে সেইসঙ্গে বেরিয়ে যায়!

পশুরাজের দেউড়ির ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজলো পাঁচটা। শেয়াল পণ্ডিত কোনোমতে মিহিগলায় ঘোষণা জানালো,—ক্যা—ক্যা হুয়া, অর্থাৎ বনে এ হলো কি ? পশুরাজ সিংহ তখন বললে,—বন্ধুগণ, আজ পশুলোকে যে কুগ্রহের উদয় হয়েছে এমনটি কোনোকালে হয়নি। পুরাণ কাহিনীতে শোনা যায়, একবার বহু বহু সহস্র বৎসর পূর্বে পশুলোকে এমনি রোগ আবির্ভূত হয়েছিল, এবং সে রোগে আমাদের অতিকায় আদি পশুর দল মরে সাফ হয়ে গেছে। নিশ্চিহ্ন বা ভূত হয়ে যায়নি তারা, কারণ ভূগর্ভ থেকে তাদের যে অতিকায় কঙ্কালরাশি পাওয়া যাচ্ছে, সে সব কঙ্কাল দেখে দুরন্ত নরকুল স্তম্ভিত হচ্ছে। আজ এ রোগেও আমাদের বিলুপ্তির আশঙ্কা সকলের মনে ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। কি করে এর প্রতিরোধ হয়, সকলে তার আলোচনা পরামর্শ করতে চাই।

ভাল্লুক বিজ্ঞ দার্শনিক, ঘোঁৎঘোঁৎ করে বললে,—পশুরাজ, আমার বিশ্বাস বিধাতা কোনো কারণে আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। বিধির কোপ ভিন্ন এমন মড়ক সম্ভব হতে পারে না।

কুকুর ঘেউঘেউ করে বলে উঠলো,—নিশ্চয় আমাদের মধ্যে কেউ-না-কেউ মহাপাপ করেছে। মহাপাপ ভিন্ন এমন মহামারী দেখা দেয় না।

বানর বললে মাথা চুলকে,—একটি জানোয়ার যদি মহাপাপ করে তো সে পাপে সমগ্র জানোয়ারবংশ···

তার কথা শেষ হবার আগেই বানরের কান ধরে টেনে বাঘ বললে,—চুপ কর তুই বানর ! ফাজলামির আসর নয় এ ! তারপর পশুদের সম্বোধন করে বললে,— সকলে অকপটে ব্যক্ত করো কে কি পাপকার্য করেছ···

ভাল্লুক বললে,—যে পাপকার্য করেছে তাকে দিতে হবে আত্মবলি, তবেই মড়কের হবে অবসান···বনের পশুবংশ পাবে রক্ষা ! চিন্তায়, বাক্যে, আচরণে কেউ যদি কোনো অপরাধ করে থাকো···জ্ঞানে বা অজ্ঞানে বা লোভে···মোহ···ক্রোধ··· হিংসা···গোপন রেখ না···অকপটে তা এ সভাসমক্ষে ব্যক্ত করো !

ভাল্লুকের কথায় জানোয়ারের দল নীরবে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো।

পশুরাজ সগর্জনে বললে,—চুপ করে আছ কেন ? বল !

···সকলেই বললে তাদের কাহিনী। [পৃষ্ঠা ১৯৬

কুকুর বললে,—কে বলা শুরু করবে ?

বানর বললে,—পশুরাজ সবার ওপরে···তিনি বলা শুরু করবেন···তারপর যার যেমন পদবী···ধাপে ধাপে।

ভাল্লুক বললে,—সমীচীন প্রস্তাব, পশুরাজ !

পশুরাজ সিংহ তখন বললে,—বন্ধুগণ, আমি মিথ্যা বলবো না—গোপন করবো না···একদিন পাহাড়ের মাথায় বসে লোকালয়ের পানে চেয়ে ছিলুম। দেখেছিলুম, সকালবেলা মাঠে অগণিত মেষপাল···নধর দেহ···হৃষ্টপুষ্ট···সযত্নে পালিত···দেখে আমার রসনা হয়েছিল লালাসিক্ত। কেবলই মনে হয়েছিল, পারতুম যদি একটি লাফে সে মেষপালের ঘাড়ে পড়তে।···কেন যে এ পাপ বাসনা মনে জেগেছিল! বেচারী মেষপাল···আমার কোনো অনিষ্ট করেনি তো!

ভাল্লুক বললে,—আমিষ অর্থাৎ মাংস ভোজন ত্যাগ করুন পশুরাজ··· নিরামিষাশী হন, তাহলে হয়তো এ মড়কের অবসান হবে।

শেয়াল বললে,—অসম্ভব! বিধির বিধান উলটে দিতে চাও প্রফেসর ভাল্লুক ? বিধাতা যাকে যে দাঁত দিয়েছেন, সে দানের মর্মার্থ ভুলে যেও না!···মেষকুলকে

পশুরাজ যে ভোজন করেন, এতে মেষকুলের মর্যাদা বাড়ে কত। নরকুলও মেষমাংস খায়—সে পাপে মড়ক হয়নি।

গাধা বললে,—যে নরকুল সদর্পে আমাদের পশু বলে অবজ্ঞা প্রকাশ করে, নিরীহ মেষের বদলে যদি শুধু সেই নরকুলকে ভোজ্য বলে গ্রহণ করেন পশুরাজ ?

শেয়াল খ্যাঁক করে উঠলো,—এমন না হলে আর তোমার নাম হয়েছে গাধা! মানুষ কত চতুর···বনের বাঘ সিংহকে নিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে সার্কাসে লড়াই করছে। তাছাড়া তাদের আছে কত রকমের অস্ত্র···তীর-ধনুক কাস্তে বন্দুক কামান। তার উপর বড় কথা হলো, নরমাংসে ভাইটামিনের অভাব। শুধু নরমাংস খেলে শরীর থাকবে না। নরদেহে নানা রোগ···ব্লাডপ্রেসার, ডিসপেপসিয়া, পিলে লিভারের দোষ। কাজেই শুধু নরমাংসে নির্ভর করলে পশুকুল অচিরে শক্তিহীন অকর্মণ্য পরাধীন হবে।

বাঘ, গণ্ডার, কুকুর, নেকড়ে সকলেই সমস্বরে বললে,—পশুরাজ হলেন পশুদের রাজা, কোনো কিছুতে তাঁর পাপ হতে পারে না। তিনি দোষশূন্য।

ভাল্লুক বললে,—তুমি বলো বাঘ, কোনো দুর্বল মুহূর্তে তুমি যদি···

বাঘ বললে,—ক্ষুধা ছাড়া বনের কোনো পশুকে আমি মারিনি। লোকালয়ে যা গিয়েছি, সে শুধু ক্ষুধার তাড়নায়···মানুষ মেরেছি, পশু মেরেছি উদরের জন্য। জীবনে আমার এক মন্ত্র—ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন—

তারপর ভাল্লুক, নেকড়ে, সাপ, গাধা, গণ্ডার, শূকর সকলেই বললে তাদের কাহিনী: পেটের দায়ে জীবহিংসা করেছি। ধারালো নখে, শানানো দাঁতে তাদের রীতিমত জোর। কাজেই সভাসদের দল তাদের কাহিনী শুনে রায় দিলে—নিষ্পাপ! ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন—

তারপর পালা এল বৃদ্ধ বলীবর্দের। ভাল্লুক বললে,—তুমি বলো বৃদ্ধ বলীবর্দ সর্দার তোমার কাহিনী।

বলীবর্দ বললে,—নিশ্চয় বলবো···অকপট সত্য কথা, পশুরাজ! পাঁচ বৎসর পূর্বে—তখন শীতকাল—প্রচণ্ড শীত—বনে বরফ পড়েছে···ঘাস-পাতা সে জমাট বরফের নীচে ঢেকে নিশ্চিহ্ন—দু'দিন আমাদের কারো আহার জোটেনি। ক্ষুধার জ্বালায় বন ছেড়ে লোকালয়ের দিকে চলেছিলুম···পথে দেখি গাড়ি বোঝাই চলেছে খড়-বিচালি! পেটের জ্বালায় সেই খড় খেয়েছিলুম।

সিংহ ব্যাঘ্র গর্জন করে উঠলো,—চোর! পরের জিনিস চুরি করে খাওয়া··· এর চেয়ে মহাপাপ আর কি আছে!

বলীবর্দ বললে,—কিন্তু পশুরাজ···প্রাণহীন খড়। আপনাদের জীবন্ত খাদ্য নয়···

সিংহ সগর্জনে বললে,—আরে আহাম্মক, আমরা খাদ্য সংগ্রহ করি বীরবিক্রমে ···"জোর যার মুলুক তার"—তোর মত নীচাশয় নই যে পরের খড়-বিচালি চুরি করে খাব!

শেয়াল বলে উঠলো,—বলীবর্দকে বলি দাও···পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক!

সভায় যেন বজ্রনাদ উঠলো। বলীবর্দ কি বলতে যাচ্ছিল, পশুদের মিশ্র অট্টরবে সে-কথা শোনা গেল না। সকলে সবলে তাকে বন্দী করে মশানে নিয়ে চললো— "জয় মা কালী—মা গো!"

এমনধারাই হয়···নর সভায় আমরাও করি এমনধারা বিচার! যে লোক দুর্দান্ত তার শত দোষেও আমরা থাকি নীরব···সে দোষ দেখেও দেখি না। আর যারা নিরীহ বেচারী, বিনাদোষে তারা করে কত না নিগ্রহভোগ!

ভেবে দেখো

৺নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক যে রাইফেল তা থেকে একটা বুলেট এক সেকেণ্ডে ২৪৪০ ফিট যেতে পারে। কিন্তু সেই প্রচণ্ড বেগের ফলে বাইরের বাতাসের উলটো চাপও প্রচণ্ড লাগে। সেইজন্যে আসলে একটা বুলেট এক সেকেণ্ডে অর্থাৎ প্রথম সেকেণ্ডে ১৮০০ ফিট যায়···দ্বিতীয় সেকেণ্ডে তার গতিবেগ কমে হয় ১২০০ ফিট, তৃতীয় সেকেণ্ডে তার গতিবেগ হয় ৯০০ ফিট। যদি লক্ষ্যবস্তু দু' মাইল দূরে থাকে, তাহলে বুলেট সেখানে গিয়ে খুব আস্তে পড়ে যায় মাত্র।

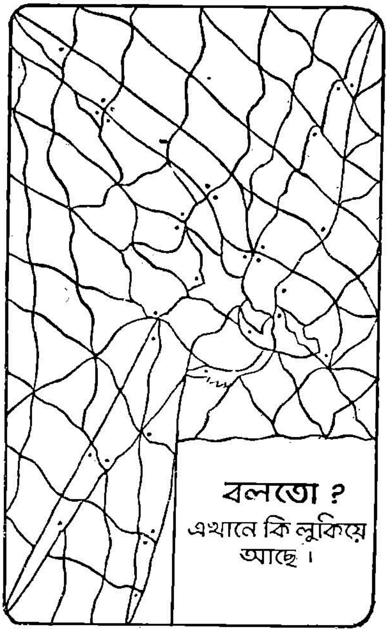

ফুটকি ঘর ভরালেই দেখতে পাবে।

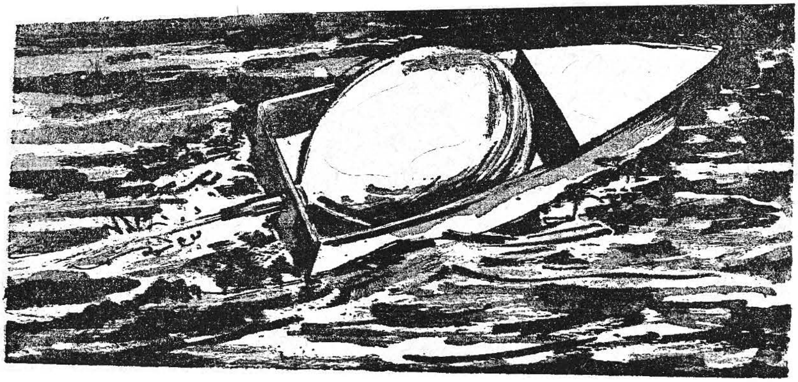

জেট নৌকা তৈরি কর

জেট প্লেন তোমরা সকলেই বোধহয় দেখেছ। এই উড়োজাহাজে কোন ঘুরন্ত পাখা নেই। তবুও এটা অনায়াসে আকাশপথে নির্বিবাদে উড়ে যায়।

আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, রকেটে চড়ে হয় কোন রাসিয়ান নয় কোন মার্কিন মহাশূন্যে ঘুরে এলেন।

এই রকেট বা জেট প্লেন যে কারণে ওড়ে তা তোমরা বোধহয় সবাই জান।

কালীপুজোর দিন হাউই উড়তে দেখেছ। হাউইয়ের পলতেতে আগুন দিলে আগুনটা তীব্রবেগে নীচের দিকে নেমে আসে আর হাউইটা আকাশপথে সোঁ করে উড়ে যায়। জেট প্লেন বা রকেট ওড়ার প্রক্রিয়া এই একই রকম।

তোমরা ইচ্ছে করলে অনায়াসে বাড়িতে একটা জেট নৌকা তৈরি করে পরীক্ষা করে দেখতে পার। এটা তৈরি করতে কতকগুলি জিনিস চাই—

(১) প্লাস্টিকের একটা নৌকা

(২) চোখে ফোঁটা ওষুধ ফেলা ড্রপার

(৩) একটা বেলুন বা ফুটবলের ব্লাডার।

এইবার নৌকার পেছনের প্লাস্টিকে এমন একটা ছেঁদা কর যাতে ড্রপারটা সেই গর্ত দিয়ে গলতে পারে।

এইবার বেলুন বা ব্লাডারের মুখে ড্রপারের চওড়া দিকটা ঢুকিয়ে ওপরটা সুতো দিয়ে বেঁধে দাও। তারপর ড্রপারের সরু দিকটা নৌকার পেছনে নতুন করা ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বাইরে বার করে সুতো দিয়ে সেটা বেঁধে দাও নৌকার সঙ্গে।

এইবার ওই সরু মুখ দিয়ে ফুঁ দাও যাতে বেলুনটা ফুলে ওঠে। তারপর ড্রপারের মুখে আঙুল দিয়ে হাওয়া বেরোন বন্ধ কর।

এইবার নৌকাটা জলে ভাসিয়ে মুখটা ছেড়ে দাও। দেখবে নৌকাটা যেদিকে হাওয়া বেরোচ্ছে তার বিপরীত দিকে চলছে।

কেন এমন হয়?

ফুলান অবস্থায় বেলুনের চারদিকে হাওয়ার চাপ সমান থাকে বলে সেটা নড়েচড়ে না। কিন্তু এক দিক থেকে হাওয়াটা বেরোতে থাকলে সেদিকের চাপ কমে যায়। তার বিপরীত দিকে চাপ বেশী থাকার ফলে সেটা সেদিকে এগোতে থাকে। ছবিটা এবার দেখলেই বুঝতে পারবে।

বহুরূপীর রং বদলায় কেন?

গিরগিটি জাতীয় এক রকম প্রাণী আছে যাদের গায়ের রং বদলায়। তাদের বলে বহুরূপী। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে রং মিলিয়ে নিজেকে লুকিয়ে ফেলার জন্যে বহুরূপী রং বদলায়।

এই সব প্রাণীর চামড়ার মধ্যে ছোট ছোট সেল খুব ঘনিষ্ঠভাবে জুড়ে থাকে। এই সব সেলের মধ্যে গ্রানিয়ুল পূর্ণ থাকে। এই গ্রানিয়ুল থেকে সাদা রং‌এর বিচ্ছুরণ হয়। অন্যান্য সেলের মধ্যে তৈলাক্ত বস্তু থাকায় তা থেকে হলদে রং বেরোয়। কোন কোন সেল লাল, কোনটায় বাদামী রং বিচ্ছুরণ করে। রং বদলান কাজটা গায়ের চামড়ার স্থান বিশেষের সংকোচনের ফলে ঘটতে থাকে।

যখন সব রং ঠেলে ওঠে তখন জীবটিকে কাল দেখায়। রংটা একেবারে চামড়ার ওপরে এসে না পড়লে সবুজ দেখায়। রংটা না এলে তাকে হলদে দেখায়।

যে যন্ত্রের ফলে এই জীব রং বদলায় সেটা এই প্রাণীর ইচ্ছামতই চলে। তাছাড়া গরম বা ঠাণ্ডাতেও রংটা বদলাতে পারে।

"৺তুলসী স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য় প্রথম
পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

মাতৃভক্তির পুরস্কার

নন্দদুলাল দেব

অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা। ফ্রান্সের সমুদ্রোপকূলে ঘুরে বেড়ায় এক বালক। ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সৈন্যদের দ্বারা সে বন্দী এবং নির্বাসিত। সমুদ্রের অপর পারেই তার প্রিয় স্বদেশভূমি ইংল্যাণ্ড। সেখানে আছেন তার প্রিয় জননী। কতদিন মা'র সঙ্গে দেখা হয় নি তা সেই বলতে পারে, আর পারেন বোধ হয় ভগবান। মাকে দেখবার জন্যে সে আকুল। মা'র প্রাণও বোধহয় সন্তানকে দেখবার জন্যে ছটফট করছে। 'মা, মাগো'—অজান্তেই তার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু।

প্রত্যহই ভোরে উঠে তার প্রথম কাজ ইংল্যাণ্ডের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। এক একদিন রৌদ্র উঠলে তার দৃষ্টিপথে উদিত হয় ইংল্যাণ্ডের সাদা সাদা বরফাবৃত অস্পষ্ট পাহাড়গুলি। যখন পাখিগুলি তাদের ডানা মেলে নীল সাগরের উপর দিয়ে ইংল্যাণ্ডের দিকে উড়ে যায়, তখন তার দৃষ্টি তাদের গতির অনুসরণ করে অগ্রসর হয়। মনের মধ্যে সদাই জাগতে থাকে—যদি আমার পাখিদের মত ওড়ার ক্ষমতা থাকত!

একদিন প্রভাতে এই বালকটি যেন স্বপ্ন দেখছে, এমনি বিহ্বলভাবে দেখতে পেল একটি বড় পিপে সমুদ্রের ঢেউয়ে তীরের দিকে ভেসে আসছে। সে পিপেটি এক গুহার মধ্যে লুকিয়ে রাখল এবং কঠোর পরিশ্রমে তার সাহায্যে এক নৌকা প্রস্তুত করতে লাগল। নিকটবর্তী অরণ্য হতে উইলো গাছের শাখা এনে সেগুলি একত্র করে নিল এবং ঐগুলির দ্বারা ভেলার তক্তাগুলো বেঁধে একপ্রকার নৌকার ন্যায় গড়ে তুলল।

কিন্তু নৌকাটি এমনই অকেজো যে, বিশ্বের সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তিও তার সাহায্যে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া ত দূরের কথা, একটি ক্ষুদ্র নদীও পাড়ি দিতে সাহস করবে

কিনা সন্দেহ। তাতে না ছিল কম্পাস, না ছিল হাল, না ছিল পাল। কিন্তু মায়ের জন্যে তার প্রাণ এমনি আকুল যে, সে একবার বিবেচনা করে দেখল না এ নৌকা জলে একদণ্ডও টিকে থাকতে পারবে কি না।

অবশেষে একদিন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সে নৌকাটি জলে ভাসাল। কিন্তু ফরাসী প্রহরীদের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে সে অসমর্থ হল। বেচারীর এতদিনের আশাকে নির্মূল করে ফরাসীরা আবার তাকে বন্দী করল, এমন কি ক্ষুদ্র তরণীটিকেও বিদ্রূপ করতে দ্বিধাবোধ করল না।

এ কথা না জানি কেমন করে নেপোলিয়ানের কানে পৌঁছুল। তিনি স্বয়ং সমুদ্রোপকূলে এসে উপস্থিত হলেন এবং চিরাভ্যস্ত অঙ্গভঙ্গীতে বালককে সম্বোধন করে বললেন, "ওহে বালক, এ তোমার কি রকম সাহস! কয়েকটা ডালপালার সাহায্যে নিতান্ত আনাড়ীর ন্যায় প্রস্তুত নৌকা দ্বারা তুমি ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে চাও। দেশে তোমার কেই বা আছেন, যাঁর জন্যে তুমি স্বীয় জীবন বিপন্ন করে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাও?"

বালকটি বলল, "দেশে আমার মা আছেন। অনেকদিন ধরে তাঁকে আমি দেখতে পাইনি। তাই মাকে দেখবার জন্যে আমার মন আকুল হয়ে উঠেছে।"—এই কথা বলতে বলতে তার চোখে জল এল।

নেপোলিয়ান বললেন, "আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তুমি তোমার মাকে দেখতে পাবে। এরূপ বীর পুত্রের জন্মদাত্রী নিশ্চয়ই একজন মহীয়সী জননী।"

এ কথা শুনে বালকের আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। সে বিস্ময় আরও বৃদ্ধি পেল যখন সম্রাট তাকে একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করলেন এবং স্বীয় জাহাজে করে ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করলেন। কিন্তু সে জানতো না যে, নেপোনিয়ানও তাঁর মাতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। গুণী ব্যক্তিই গুণীর সম্মান করতে জানেন। তাই নেপোলিয়ান বালকটির মাতৃভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে স্বর্ণমুদ্রাটি উপহার দিয়েছিলেন। বালকটিও শত অভাব-অনটন সত্ত্বেও মাতৃভক্তির পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত এই স্বর্ণমুদ্রাটি কখনও বিক্রয় করেনি।

"৺তুলসী স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য় দ্বিতীয়
পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

মাতৃভক্ত বালকের কাহিনী

কুমারী শিবানী দত্ত

অনেকেই বৈদিক যুগের ঋষিকুমারদের নাম শুনেছ। আমিও তোমাদের অমনি এক মাতৃভক্ত তাপস বালকের গল্প শোনাব।

আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগের কথা। যখন মানুষ ভগবানের সাথে কথা বলতে পারত তখনকার কথা। তখন সরস্বতী আর দৃষদ্বতী নদীর মাঝখানে অনেক মুনি-ঋষিদের আশ্রম ছিল। সেখানে মহীদাস নামে একটি বালক বাস করত। তার মা'র নাম ছিল ইতরা। সে ছিল খুব মাতৃভক্ত। তার বাবার নাম আমরা কেউ জানি না। সেই কাহিনীই আজ তোমাদের শোনাব।

মহীদাসের বাবা ছিলেন খুব বড় পণ্ডিত। সেখানকার সব আশ্রমের দেখাশুনার ভার তাঁরই উপর ছিল। তিনি যেমন পণ্ডিত তেমন রাগী ছিলেন তাই সবাই তাঁকে ভয় করত। তাঁর ছিলেন তিন পত্নী। মহীদাস যখন খুব ছোট তখন তার বাবা একদিন রাগ করে তার মাকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

কি আর করবেন, ইতরা মাতা মহীদাসকে নিয়ে দৃষদ্বতী নদীর তীরে এক কুটিরে বাস করতে লাগলেন। বনের ফলমূল আর ভিক্ষার অন্নেই তাঁদের দিনের পর দিন বছরের পর বছর কাটতে লাগল। এদিকে মহীদাসও তখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে। হঠাৎ একদিন সে তার মাকে এসে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা মা, আমার বাবা কোথায়?

ইতরা বুঝলেন যে ছেলে এখন বড় হয়েছে, এবার তাকে সবই বলতে হবে। তখন তিনি বললেন, বাছা! তোমার বাবা আছেন তবে তিনি এখানে থাকেন না। অনেক দূরে একটি সুন্দর আশ্রম বাড়ি আছে ওখানেই তিনি থাকেন। তিনি মস্ত বড় পণ্ডিত। তোমাকে তোমার বাবার মত পণ্ডিত হতে হবে। আর সেখানে তোমার বিমাতা আর ছোট ভাইরা আছেন। কিন্তু একটা কথা বাবা, তুমি কোনদিন ওখানে যেও না, কারণ তুমি তাঁর পরিত্যক্ত পুত্র। এই বলে ইতরা মা

কাঁদতে লাগলেন। মায়ের কান্না দেখে মহীদাসের মন ব্যথায় ভরে উঠল।

একদিন মহীদাস মাকে লুকিয়ে বাবার আশ্রমে গেল। তখন সেখানে যজ্ঞ হচ্ছিল। চারদিকে মহীদাসের বাবার শিষ্যরা বসে আছে। মহীদাস যজ্ঞশালার দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে অন্যান্য ভাই বোনদের সঙ্গে বাবাকে বসে থাকতে দেখে কাছে গিয়ে প্রণাম করল। কিন্তু ঋষি চীৎকার করে তাকে বেরিয়ে যেতে বললেন আশ্রম থেকে। এত লোকের সামনে অপমানিত হয়ে মহীদাস কাঁদতে লাগল। তা দেখে ঋষির শিষ্যদের মনে খুব দুঃখ হল, কিন্তু গুরুদেবের মুখের উপর কিছু বলার ক্ষমতা তাদের হল না।

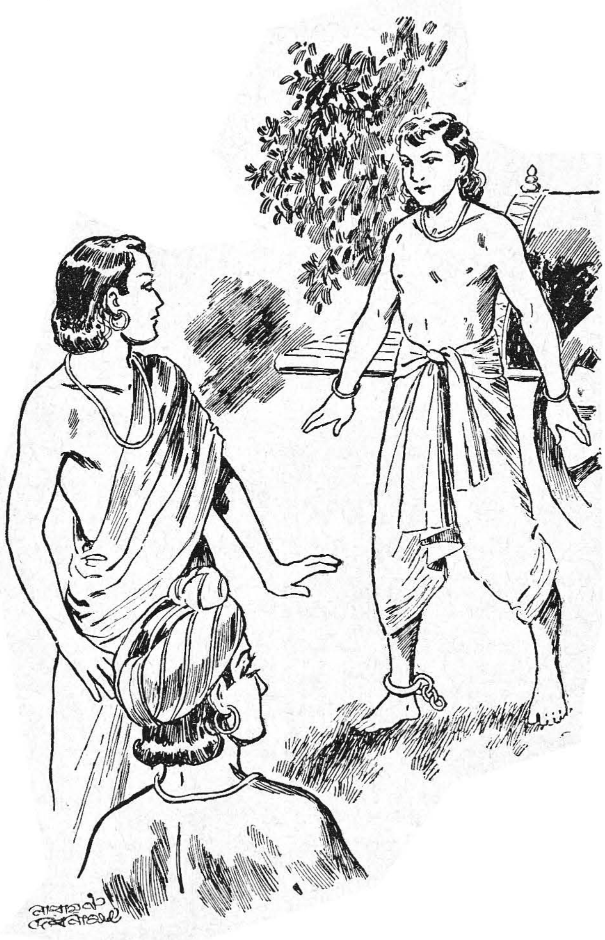

মহীদাস যজ্ঞশালার দিকে এগিয়ে গেল।

মহীদাস পিতাকে সম্বোধন করে বলল, বাবা! আপনি মোহের বশে আমার মাকে ত্যাগ করেছেন, আজ আমাকেও ব্যথা দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। আমি শুধু আপনাকে প্রণাম করতেই এসেছিলাম, তা করেছি সুতরাং আমার কামনা সফল হয়েছে। তবে আমি এখানে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করছি যে আমি এমন কিছু করব যাতে জগৎ আপনাকে ভুলে যাবে কিন্তু আমার মাকে মনে রাখবে চিরদিন।

এই কথা বলে মহীদাস কাঁদতে কাঁদতে আশ্রম থেকে বেরিয়ে এল। কুটিরে

এসেই সে মায়ের কোলে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। ইতরা মাতা সন্তানকে প্রবোধ দিলেন। তখন মহীদাস মাকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা মা, মানুষ কি করলে সব বিদ্যায় জ্ঞান লাভ করতে পারে?

ছেলের প্রশ্ন শুনে ইতরা মা হেসে বললেন, বাবা মহি! আমি তোমাকে ভূমিদেবীর পূজো করে পেয়েছি, সুতরাং তুমিও তাঁর আরাধনা কর তবেই সব রকম জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

সেই দিন থেকে শুরু হল মহীদাসের তপস্যা। ধ্রুবর মতো সে বনে বসে একমনে ভূমিদেবীকে ডাকতে লাগল। চোখে তার পলক পড়ে না—গাল বেয়ে পড়ছে ভক্তির অশ্রু। এমনি করে চল্লিশ দিন কেটে গেল। চল্লিশ দিন পর বালকের কাতর আহ্বান বুঝি দেবীর কানে পৌঁছল। সূর্যাস্তের গোধূলি আলোয় সমস্ত জগৎ ছেয়ে গেছে, এখুনি সন্ধ্যার কালো আস্তরণ নেমে আসবে, ঠিক এমনি সময় চারদিক আলো করে ভূমিদেবী আবির্ভূত হলেন মহীদাসের সামনে। তিনি মহীদাসের বিহ্বল ভাব দেখে হেসে বললেন, মহীদাস, আমি তোমার ডাকে সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি বর চাও।

মহীদাস বলল, মা, তুমি তো আমার মনের কথা সবই জান, তা যাতে সফল হয় তেমন বর দাও।

ভূমিদেবী বললেন, তথাস্তু। আমার বরে তুমি সব শাস্ত্রে পণ্ডিত হবে আর বাক্‌সিদ্ধ হবে। যতদিন চন্দ্র সূর্য পৃথিবী আছে ততদিন তোমার মাকে কেউ ভুলবে না। আর আজ থেকে তুমি যা বলবে তাই বেদমন্ত্র হবে।

সেদিনই মহীদাসের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো মন্ত্র, সৃষ্টি হল ঐতরেয় উপনিষদের।

একদিন ইতরা মাতা মহীদাসকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বাবা মহি, শাস্ত্রে আছে "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ…" কিন্তু তোমার গ্রন্থে পিতার নাম নেই কেন?

মায়ের প্রশ্ন শুনে মহীদাস হেসে বললেন, মা, আমি যে পরিত্যক্তার পুত্র! তাই এই সৌভাগ্যকে জগতে অমর করে যেতে চাই। আর শাস্ত্রে এও তো আছে— "জননী…স্বর্গাদপী গরীয়সী"…।

এমনিভাবে মহীদাস মাকে পৃথিবীর বুকে অমর করে রেখে গেলেন। সত্যই আজ জগৎ মহীদাসের পিতাকে ভুলে গেছে কিন্তু ইতরা মাতাকে কেউ কোন দিন ভুলবে না, কারণ তিনি ঐতরেয় উপনিষদের মধ্যে চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন।

দিদি

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

"দিদি, ও দিদি"—

দরজার কড়া কোন্ জন্মে খুলে গিয়েছে, বাড়িওয়ালা আজও তা নতুন ক'রে লাগাবার দরকার বোঝেনি। কেন সে লাগাবে? কড়া ত সামান্য কথা, দরজাটাই যদি না থাকে, তবু ঘরে ভাড়াটে জোটার আটক নেই। একজন উঠে যেতে না যেতে একশোজন এসে বস্তির সামনে ভিড় করে—"এখানে নাকি ঘর খালি আছে মশাই?"

দরজায় কড়া নেই, কাজেই ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছাড়া উপায় কী? তাই অনুপ ডেকেই যায় ক্রমাগত—"দিদি, ও দিদি!"

সন্ধ্যে হয়েছে বহুক্ষণ, বহুদূর থেকে বড়রাস্তার গ্যাসের আলোর একটু আভাস যেন পাওয়া যায় সরু গলিটায় দাঁড়িয়ে। আশপাশের খোলার ঘরের সারি সারি দরজা সব অন্ধকার; কদাচিৎ যদি কোথাও মাটির দেয়াল থেকে মাটি খ'সে প'ড়ে থাকে, তবে সেইখানে ভিতরকার বাঁশের বাঁখারির কাঠামো ভেদ ক'রে বেরিয়ে আসছে কুপির আলোর একটা ক্ষীণ আভা। তা ছাড়া সব দিকেই ভুতুড়ে আঁধার, সব দিক থেকেই আসছে পচা গন্ধ, সব ঘরেই শোনা যায় শিশুর কান্না আর বুড়োদের গজরানি। শিশুর এ কান্না আদুরে কান্না নয়, রীতিমত ক্ষিধের কান্না। আর বাপ-মায়ের এই যে ধমক-চমক, নিছক রাগ থেকে এর উৎপত্তি নয়, রাগ আর দুঃখ সমানভাবে একজায়গায় মিশলে তবেই মানুষের গলা দিয়ে এরকম বিশ্রী আওয়াজ বেরুতে পারে।

"দিদি, ও দিদি"—সমানভাবে ডেকেই চলেছে অনুপ। তার ভয় করছে। এত ডাকাডাকি ত কোনদিনই করতে হয় না। সে আসে, দরজায় দাঁড়িয়ে ছোট্ট ক'রে একবারটি ডাক দেয় বিন্দুকে। আর অমনি খুট্ ক'রে খুলে যায় ওদিককার ছিটকিনি। সামান্য একটু ঠেলা দিলেই সে দেখতে পায়, ভিতরে সরষের তেলের পিদিম জ্বালিয়ে ছেঁড়া কাপড় সেলাই করছে বিন্দু, আর দড়ির চারপাইয়ের উপর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন বিন্দুর বাবা, যাঁকে অনুপ ডাকে মেসোমশাই ব'লে।

"দিদি, ও দিদি"—অন্ততঃ বিশবার ডাকবার পর ভিতর থেকে সাড়া এল—"কে, অনুপ?"

গলাটা বিন্দুর নয়, বিন্দুর বাবার।

অনুপের ভয়টা দারুণ বেড়ে গেল। দিদির নির্ঘাত কোন বিপদ ঘটেছে। তা নইলে

তার বাবা—পক্ষাঘাতের রোগী—তিনি কেন জবাব দিতে যাবেন অনুপের ডাকে! বিপদ এ জায়গায় সব রকমই হ'তে পারে। খুন, জখম এসব বস্তিতে হামেশাই হয়। সে রকম কিছু এখানে ঘ'টে থাকলেও অবাক হবার কিছু নেই। একটি পোনেরো বছরের মেয়ে, আর একটি ষাট বছরের বুড়ো। বুড়োটি আবার বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না, বাঁয়ের অঙ্গটা তাঁর অবশ হ'য়ে গিয়েছে আজ বছর পাঁচেক হ'ল।

সেই পাঁচবছরের প'ড়ো রুগীকেই কিন্তু আজ উঠে এসে দোর খুলতে হ'ল। কী ক'রে তিনি এই অসাধ্য সাধন করলেন, বাইরে থেকে অনুপ তা বুঝবে কেমন ক'রে? দরজা যখন খুলল, তখন শুধু তার চোখে পড়ল যে বুড়ো মেসোমশাই দেয়াল ধ'রে ধুঁকছেন, আর ঘরের শেষ মাথায় একটা বোঁচকার মত গোল হ'য়ে প'ড়ে আছে তার দিদি। প'ড়ে আছে একখানা ছেঁড়া মাদুরে, গায়ে দিয়ে তারই দ্বিতীয় শাড়িখানা।

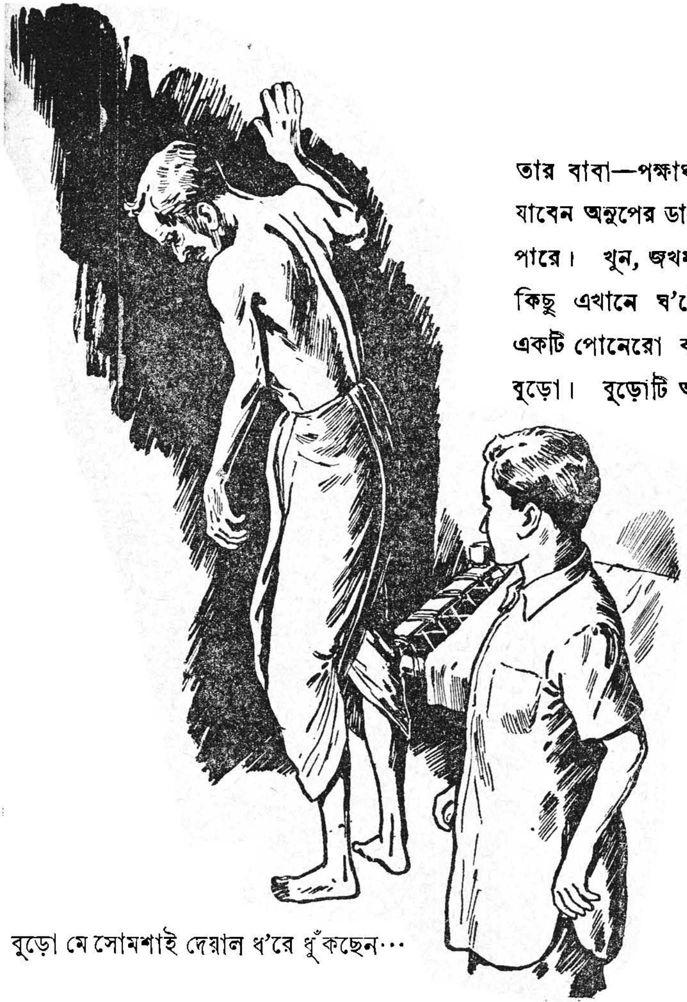
বুড়ো মেসোমশাই দেয়াল ধ'রে ধুঁকছেন···

মেসোমশাই বললেন—"জ্বর হয়েছে বিন্দুর। ধুম জ্বর, একদম বেহুঁশ হ'য়ে আছে মেয়েটা অন্ততঃ ঘণ্টা চারেক।"

অনুপের হাতের মালগুলো দরজার বাইরে পড়ে ছিল। এইবারে সে ভিতরে এনে ফেলল সেগুলি। তারপরে দরজাটা চেপে দিয়ে প্রথমে ধরল মেসোমশাইকে; তাঁকে শুইয়ে দিল কম্বলের তলায়। সব শেষে সে ছুটল বিন্দুর দিকে। কপাল থেকে কাপড় সরিয়ে হাত দিয়ে দেখল প্রথমে। উঃ, পুড়ে যাচ্ছে গা! জ্বর সত্যিই খুব বেশী। 'দিদি' ব'লে গায়ে আস্তে আস্তে ঠেলা দিতে লাগল অনুপ।

কয়েকবার ঠেলা খেয়ে বেহুঁশ মেয়েটা চোখ মেলল একটিবার। কিন্তু সে চোখে একটা ঘোলাটে চাউনি। ছোট্ট ঘর, আলোটা নিকটেই, কাজেই সে-চাউনি যে কত ঘোলাটে তা অনুপের নজর এড়িয়ে যেতে পারল না। ভয় পেয়ে গেল অনুপ। বিন্দু যে তাকে চিনতে পারছে না, তা ঠিক। চিনতে পারলে সে এখনও চুপ ক'রে থাকবে এ মোটেই সম্ভব নয়।

কপালে আবার কাপড় চাপা দিয়ে রেখে বিন্দুর পাশ থেকে স'রে এল অনুপ।

"কী দেখলে বাবা?"—খাটিয়া থেকে চিঁ চিঁ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন মেসোমশাই।

"দেখলাম জ্বর, খুবই জ্বর।" বলল অনুপ। "তবে ভাববার কী আছে? একটা ডাক্তার ডাকতে পারলে—"

"ডাক্তার!"—হতাশার সুর বেজে উঠল বৃদ্ধের কথার সুরে। "তুমি দুটো খেতে দিচ্ছ, তাই আমরা খেতে পাচ্ছি। ডাক্তারের টাকা কোথায় পাব? তুমিই বা পাবে কোথায়? ভদ্দর-লোকের ছেলে জুতো বুরুশ করছ আমাদের জন্যে, তাতে আর কতই বা পাও?"

অনুপের মুখে হঠাৎ কথা যোগাল না। কোথা থেকে ডাক্তারের টাকা আসবে, সেটা একটা ভয়ানক ভাবনার কথাই বটে! সে ভাবছে, গভীরভাবে ভাবছে।

মুরারিবাবুর একটা স্বভাব—সব বুড়োদেরই স্বভাব ওটা—কথা শুরু করলে আর থামতে চান না। নিজের মনেই তিনি গোঁ গোঁ করছেন—"আমার বরাতই অমনি। যে আমার ছোঁয়াচের ভিতর আসে, সেই কষ্ট পায়। কোথাকার কে তুমি, তা জানি নে; হঠাৎ একদিন দেখা! সেই থেকে তোমার ভাগ্যে হাজার কষ্ট! ছিঃ ছিঃ—জুতো বুরুশ আমাদের জন্যে? ভদ্দর-লোকের ছেলে হ'য়ে জুতো বুরুশ? তুমি স্বীকার করো না যে তুমি ভদ্দরলোকের ছেলে। চেহারা—আরে, ও কি লুকোনো যায়? আগুন কি ছাইচাপা থাকে? যে তোমায় দেখবে, সেই যে বলবে তুমি যা-তা বংশের ছেলে নয়। অমন ধবধবে রং, অমন টিকোলো নাক, টানা চোখ—আর—"

বুড়ো ঘড়ঘড় করে হেসে ফেললেন বুঝি বড় দুঃখে। "আর গলায় ঐ সোনার হার! জামার ভিতরে লুকিয়ে রাখো বটে, কিন্তু আমরা ত আর কানা নই, এতদিনের ভিতরও কি আমাদের চোখে পড়ে নি যে অনুপের গলায় সোনার হার আছে? বিন্দু আমায় চুপিচুপি বলে—'বাবা, ভাই আমার বড়লোকের ছেলে'—"

অনুপ হঠাৎ বাধা দেয়। "মেসোমশাই, আমি ডাক্তারের চেষ্টায় যাচ্ছি"—এই কথাটি ব'লে তার জুতো বুরুশের সরঞ্জামগুলি ঠেলে গুছিয়ে রাখল চারপাইয়ের তলায়। আর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সুট্ ক'রে। মেসোমশাই কী যেন জিজ্ঞাসা করছেন ওদিক থেকে, হয়ত এই কথাই জানতে চাইছেন যে অনুপের আজকের রোজগার থেকে ডাক্তারের আর ওষুধের খরচা কুলিয়ে যাবে কি না, আর কুলিয়ে গেলেও আজ রাত্তিরের আর কাল সারা দিনের ভাত ডাল রুটি যোগাড় করবার পয়সা তার পরও অনুপের হাতে থাকবে কি না।

এসব কথায় কান দেওয়ার মত সময় নেই অনুপের। রাত ওদিকে আটটা হ'ল। আজকাল অনুপ রোজই একটু রাত ক'রে বাড়ি ফেরে, তা সত্যি। ইস্কুল ছুটির পর রাস্তার মোড়ে বসতে হয় জুতো বুরুশের মালপত্তর নিয়ে, ঘণ্টা তিনেক কাজ না করলে আর কোনমতেই এ-দুটি প্রাণীর খাওয়ার পয়সাটা যোগাড় হ'য়ে ওঠে না। কাজেই রাত তার এখন রোজই হয়। তবু এত রাত কোনদিন হয় না। আজ যা গেরো বেধেছে, কখন যে এ-বাড়ি থেকে তার ছুটি মিলবে, কোন আন্দাজই করতে পারছে না অনুপ। ডাক্তার এ বস্তিতে নেই, যেতে হবে বেশ খানিকটা পথ, বড়রাস্তা দিয়ে মার্কেটের দিকে। ডাক্তার ডাকা, তাঁকে নিয়ে আসা, রোগী দেখানো, ওষুধ আনবার জন্য আবার ডাক্তারখানায় ফেরা, দোকান থেকে বার্লি মিছরি কেনা, বার্লিটা আবার তাকেই জ্বাল দিতে হয় যদি, না না, ওই কাজটি সে করতে পারবে ব'লে ভরসা হয় না, জীবনে সে কোনদিন খোলা উনুনের পাশে বসে নি। পাশের ঘরের কোন মেয়েছেলে কি দয়া ক'রে দিদির জন্যে বার্লিটা জ্বাল দিয়ে দেবে না?

দিক বা না দিক, রাত্তিরের ভিতর বাড়ি ফিরতে পারা আজ খুব সন্দেহ। বাড়িতে এমনিই তার অশান্তির শেষ নেই, বৌদি ত অনবরত লাগাতেই আছেন তার নামে, তার উপর একটা গোটা রাত বাড়ি না ফিরলে কী যে অনর্থ ঘটবে, ভাবতেও ভয় হ'তে লাগল বেচারা অনুপের।

ঐ ত ডাক্তারখানা!

ডাক্তার এলেন, বিন্দুকে দেখলেন, ভুরু কুঁচকে ঘরের চারদিক একবার দেখে নিলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন খাটিয়ায় শোওয়া মুরারিবাবুকে, "আপনারও কি অসুখ?"

গোঁ গোঁ ক'রে আওয়াজ বেরুলো মুরারিবাবুর কম্বলের তলা থেকে—"আমারও অসুখ বটে, তবে তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমার মেয়েকে দেখুন। আমরা একান্ত গরীব ডাক্তারবাবু, যদিও চিরদিন এমন ছিল না। আমি হেডমাস্টার ছিলাম মশাই, হেডমাস্টার; সেকালের বি. এ. পাস। জানেন ত, মাস্টারি যারা করত সেকালে, ভিখিরীর অধম ছিল তারা। আমি মশাই ত্রিশ বছর মাস্টারি করার পর পক্ষাঘাতে শয্যা নিলাম, কাঁথা কম্বল বেচে আমার স্ত্রী আমায় কলকেতায় নিয়ে এল চিকিৎসার জন্যে। তারপর আর কি, স্ত্রী মরেছে, আমি বেঁচে আছি। এইবারে মেয়েটাও মরবে—আমি তবু বেঁচে থাকব—"

ওষুধের ব্যবস্থা লিখতে লিখতে ডাক্তার একবার থেমে গেলেন। অনুপের দিকে তাকিয়ে বললেন—"এ ছেলেটি আপনার কে?"

"ঐ ছেলেটি?"—বৃদ্ধ ডান হাতের উপর ভর দিয়ে যতটা সম্ভব সোজা হ'য়ে বসলেন। "আমার কেউ নয়, আবার সব। ঐ বারো বছরের ছেলে জুতো বুরুশ ক'রে আমায় খাওয়ায়। ভাল বংশের ছেলে। ওদের ইস্কুলের এক দল ছাত্র একদিন এল এই বস্তি সাফ করবার জন্যে। অনুপ ছিল সেই দলে। সেই সময় আমার বিন্দুর সঙ্গে ওর দেখা। কী শুভক্ষণে যে দেখা মশাই! এ বলে দিদি, ও বলে ভাই। নিজের দিদির জন্যেও কোন ভাই এমন করে না।"

*　*　*

পরের দিন সকালবেলা চায়ের টেবিলে ব'সে বিভাবতী স্বামীকে বললেন—"জানো গা, তোমার আদরের ভাই কাল রাত্তিরে বাড়ি আসেন নি!"

যতীন আঁতকে উঠল। "বাড়ি আসে নি? কী সর্বনাশ! তা তুমি রাত্তিরে আমায় বললে না?"

"বললে কী হ'ত?" ঝাঁঝিয়ে ওঠেন বিভাবতী—"সারা দিন আফিসে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে এসে সারা রাত্তির আবার থানা আর হাসপাতাল ক'রে বেড়াতে ত? আমি ইচ্ছে ক'রেই বলি নি! জ্ঞাতি ভাইয়ের জন্যে

"এ ছেলেটি আপনার কে?"　[পৃষ্ঠা ২০৮

খরচান্ত ত হ'চ্ছেই, এখন জীবনান্ত হওয়াটাই বাকী। তা আমি যতক্ষণ আছি, সেটা আর হ'তে দিচ্ছি নে। বদমাইশের জাসু, এই বয়সেই ওর পাখা উঠেছে, তা জানো? আগে ইস্কুল থেকে আসত সাড়ে চারটের ভিতরই। এখন আসে রাত আটটা নটায়। কোথায় যাস জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেয় না। ও ছেলে গোল্লায় গিয়েছে। ক'লকেতা শহর, কুসঙ্গের অভাব?"

তাড়াতাড়ি চা খাওয়া শেষ ক'রে যতীন জামা গায়ে দিল। "কী? চললে বুঝি গুণনিধি ভাইয়ের খোঁজে?" টিটকারি দিয়ে উঠলেন বিভাবতী—"তাহলে আফিস যাওয়া টঙে উঠল আজ? বেশ, যাও—আমিও তাহলে আজ সইয়ের বাড়িটা ঘুরে আসি এই ফাঁকে।

কতো দিন থেকে খোশামোদ করছে! আজ যখন তোমার আফিস কামাই, একটু বেলাতেই না-হয় এসে খেয়ো। বামুনকে আমি ব'লে যাব এখন তোমার খাবার চাপা দিয়ে রাখবার জন্যে।”

যতীনের আফিস যাওয়া না-যাওয়ার সঙ্গে বিভাবতীর সইয়ের বাড়ি যাওয়া না-যাওয়ার যে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না, একথা তুলে কথা বাড়ানো আর দরকার মনে হ'ল না যতীনের। ভাইটার ব্যাপার নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মতের মিল কোনদিন হয় নি, হবেও না। কাজেই ও তর্কে ফল কী? বিভাবতী ধ'রে নিয়েছেন—রাত্রে যখন অনুপ ফিরে আসে নি, তখন সে গোল্লায় গিয়েছে। আর যতীন ধ'রে নিল—রাত্রে যখন অনুপ ফিরতে পারে নি, তখন সাংঘাতিক কোন একটা বিপদে সে পড়েছে। ভাবতেই বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল তার। নিজের ভাই নয় অনুপ, তার দূর-সম্পর্কের এক খুড়তুতো ভাই। ওর মা-বাপ যখন একই দিনে প্রায় একসঙ্গে মারা গেলেন কলেরায়, তখন খবর পেয়ে একান্ত অকারণেই যতীন ছুটে গিয়েছিল গ্রামের বাড়িতে, আর আত্মীয় কুটুমদের অবাক ক'রে দিয়ে পাঁচবছরের ভাইটাকে কোলে ক'রে এনে ফেলে দিয়েছিল নিজের মায়ের কোলে। সে মা আজ নেই, মায়ের জায়গা অধিকার করেছেন আধুনিকা বিভাবতী। তাঁর বি. এ., এম্. এ.র কোন কেতাবে এমন কথা কোথাও তিনি পড়েন নি যে স্বামীর ভাইদের নিজের ঘরকন্নার ভিতরে ঠাঁই দিতে হবে। তাতে অনুপ ত আবার আপন ভাইও নয়, নেহাতই কুড়িয়ে-আনা দূর-সম্পর্কের ভাই!

যতীন হন্তদন্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়। প্রথমে ইস্কুল। হ্যাঁ, অনুপ কাল ইস্কুলে এসেছিল, ঠিক চারটে পর্যন্ত ছিলও ইস্কুলে, তারপর আর তার খবর এখানকার কেউ জানে না।

থানা। টেলিফোন ক'রে ক'রে কোনও থানা থেকেই যতীন খবর পেল না অনুপের। ওরকম কোন ছেলে কোনও কারণে কাল ধরা পড়ে নি কোন থানায়। হাসপাতাল। নাঃ, কোনও হাসপাতালও কোনও সন্ধান দিতে পারে না।

তবে কি বিভাবতীর কথাই সত্যি? ছেলেটা খারাপই হ'য়ে গিয়েছে? চোর-গাঁটকাটার দলে মিশে তাদের আড্ডাতেই আশ্রয় নিয়েছে? উঃ, ভাবতেও বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।

না, না—এ সম্ভব নয়। যতীন নিজের মনকে বার বার ধমক দেয়—দেবদূতের মত ছেলে অনুপ, তার পক্ষে এমন হওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। পুবের সূর্য পশ্চিম আকাশে উঠলেও নয়। নিশ্চয়ই তার কোন বিপদ হয়েছে। কী করা যাবে তাহলে? গোয়েন্দার সাহায্য?—ঘুরতে ঘুরতে ইস্কুলের পাড়াতেই যতীন এসে পড়ল আবার। তার এক গোয়েন্দা বন্ধুর বাড়ি এই দিক পানেই। তার সঙ্গে একবার পরামর্শ করা যাক।

পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল যতীন। কে ঐ দাঁড়িয়ে স্যাকরা দোকানটাতে? ভাল ঠাহর হয় না এখান থেকে, তবু যতীনের মন যেন ডেকে বলে—ঐ বটে! ঐ বটে! অনুপই নিশ্চয়ই!

কিন্তু, অনুপ যদি হবে, সে স্যাকরা দোকানে করবে কী ?

ধীরে ধীরে যতীন গিয়ে দাঁড়াল দোকানটার দরজায়। এমন জায়গায় দাঁড়াল, যাতে ভিতরের লোকেরা তাকে দেখতে না পায়।

অনুপই কইছে কথা। "আমাদের খুবই বিপদ। এই হারছড়া বাঁধা রেখে বা কিনে নিয়ে আমায় কিছু টাকা দিন।"

দোকানী চুপ ক'রে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল—"তোমার ঠিকানা রেখে যাও, আধঘণ্টা বাদে এস। খোঁজখবর না নিয়ে এতটুকু ছেলের কাছ থেকে আমি সোনার গয়না নিতে পারি নে। তোমার চেহারা দেখলে তোমায় অবিশ্বাস করা যায় না, তা মানি। তবু, সাবধান আমাদের হ'তে হয়। দিনকাল খারাপ।"

গলার হারটা জামার নীচে ঢোকাচ্ছে সাবধানে।

যতীন পাশের দোকানে ঢুকে পড়ল তাড়াতাড়ি। এ সময়ে অনুপের মুখোমুখি সে পড়তে চায় না। পাশের দোকান থেকেই সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল অনুপ বেরিয়ে আসছে স্যাকরার ঘর ছেড়ে। তার গলার হারটা জামার নীচে ঢোকাচ্ছে সাবধানে।

হার ?—হ্যাঁ, যতীনের মনে প'ড়ে গেল—একছড়া সরু হার অনুপের গলায় বরাবরই আছে। ওটা তার বাপ-মায়ের দেওয়া।

কী এমন বিপদ হ'ল অনুপের যে তাকে আজ সেই সোনার হার বেচতে বা বাঁধা দিতে হবে ?

অনুপ ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে একটু দূরে গিয়ে পড়তেই যতীন রুমালে মুখ ঢেকে ঢুকল গিয়ে স্যাকরার দোকানে। তার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা ক'য়ে অনুরোধ করল— "আপনি হারটা কিনবেন

না, বাঁধাই রাখুন। যত টাকা ও চায়, আপনি দিন। এই আমার কার্ড রইল। আপনার কোন বিপদ হবে না, কথা দিচ্ছি আমি। ও হার আবার আমিই খালাস করিয়ে দেব।"

যতীন বেরিয়ে উলটো দিকের ফুটপাতে আলোর পোস্টের আড়ালে দাঁড়াল, সেখান থেকে দেখতে পেল অনুপ আবার ফিরে আসছে স্যাকরা দোকানের দিকে। উস্কখুস্ক চুল, কেউ মুখে কালি মেরে দিয়েছে যেন! সারা রাত্তির ঘুম না হ'লে যেমন চেহারা হয়, অবিকল সেই চেহারা। যতীনের চোখে জল এল, ইচ্ছে হ'তে লাগল ছুটে গিয়ে ভাইটিকে কোলে জড়িয়ে ধ'রে জিজ্ঞাসা করে—"কী হয়েছে তোর, আমায় বল। আমি তোর দাদা বেঁচে থাকতে তোকে গলার হার বাঁধা দিয়ে কেন টাকা যোগাড় করতে হবে?"

কিন্তু মনকে সংযত করল যতীন। একটু ধৈর্য ধ'রে থাকলেই সব বোঝা যাবে। বিভাবতীর আচরণ দুই ভাইয়ের ভিতর যে আড়াল আর ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে রেখেছে, হঠাৎ গিয়ে সামনে দাঁড়ালে তা ভেঙে পড়ার বদলে আরো শক্ত পোক্ত হ'য়ে উঠতে পারে।

* * * *

এক কৌটো বার্লি, কিছু কমলালেবু, একখানা তুলোর কম্বল আর চাল ডাল কিনে নিয়ে যখন অনুপ এসে বস্তির ঘরে ঢুকল, তখনও বিন্দু জ্বরে অচৈতন্য। মেসোমশাই অনুপকে দেখেই ব'লে উঠলেন—"এত-এত সব জিনিস? কোথায় পেলে বাবা? এ ত অনেক টাকার জিনিস দেখছি! জুতো বুরুশে ত এত টাকা হয় না। আর বুরুশের মালপত্তর ত তুমি সঙ্গে নিয়ে যাওনি! তবে কি চুরিচামারি করলে বাপ? এই অভাগাদের বাঁচাবার জন্যে তোমায় কি শেষে চুরিচামারি করতে হ'ল?"

"না, তা হয় নি মেসোমশাই।" অনুপ শান্তভাবেই উত্তর দিল—"তা এখনো হয় নি। তবে দিদিকে বাঁচাবার জন্যে যদি দরকার হয় কোনদিন, চুরিচামারিও আমি করব মেসোমশাই!"

"না, অনুপ, তা তোকে কোনদিন করতে হবে না। তোর দিদিকে বাঁচাবার জন্যে তোর দাদা আছে।"—বলতে বলতে যতীন ঘরে ঢুকে অনুপকে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরল।

সেয়ানে সেয়ানে

শ্রীনিতাইচন্দ্র দাস

পটলা: আরে হাবলা, তুই বলে দার্জিলিং গেছিলি? তা ওখানে ঠাণ্ডা কেমন রে?

হাবলা: ঠাণ্ডার কথা আর বলিস না! একদিন আমি আমার পিসতুতো বোন রেবাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি। হঠাৎ কেউ কারও কথা শুনতে পাই না। কথাগুলো সব বরফ হয়ে জমে যাচ্ছে।

পটলা: তুই একটা গর্দভচন্দ্র! তখন ফস্ করে একটা দেশলাই জ্বালালেই বরফ গলে যেত আর সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলো তোরা শুনতে পেতিস।

(১৮৭ পৃষ্ঠার পর)

(ক্রমশঃ)

তরোয়াল মাছ

অরুণকুমার

কাকাবাবুর হঠাৎ বাই চাপলো।

একদিন দেখি অফিস থেকে ফিরে আসার পথে তিনি কাচের একটা ছোট চৌবাচ্চা কিনে এনেছেন। চৌবাচ্চাটার চারদিকে কাচ, কেবল কোনাগুলোয় এলুমিনিয়ামের ত্রিকোণ দিয়ে আঁটা।

কৌতূহলের বশে জিজ্ঞেস করলুম, কাকাবাবু, এটা কি হবে?

কাকাবাবু বললেন, এর নাম হচ্ছে অ্যাকোয়ারিয়াম। এতে মাছ পুষবো।

লোকে কুকুর পোষে, বেড়াল পোষে, কেউ কেউ খরগোশ গিনিপিগ বিলিতী ইঁদুরও পুষছে জানি। মাছ পোষার কথা কখনও শুনিনি। চিরকালই দেখে আসছি ছেলেমেয়েদের খাওয়াবার জন্যে কই, মাগুর, শিঙি মাছগুলো মা গামলা বা চৌবাচ্চায় জিইয়ে রাখেন আর প্রয়োজন মত মেরে রান্না করে দেন। তাই মাছ পোষার কথায় কৌতূহলটা খুবই বেড়ে গেল।

তারপরদিন রবিবার। অফিস ছুটি। দেখি কাকাবাবু একটা কাচের জার হাতে বাড়ি থেকে সকালবেলা বেরোচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলুম, কাকাবাবু, কোথায় যাচ্ছ?

হাতীবাগানের বাজারে।

তোমরা হয়তো ভেবে বসবে, কাকাবাবু হয়তো পয়সা রাখবার জায়গা পাচ্ছেন না, তাই হাতী কিনতে যাচ্ছেন। হাতীবাগানে এককালে হাতী ছিল কি না জানি না, কিন্তু গুণিরাম হাতীর বংশধররা এখনও সেখানে বাস করে বলে শুনেছি। আসল হাতী না গুণিরাম হাতীর নামে জায়গাটা বিখ্যাত সেটা গবেষকরা বলবেন। কিন্তু কাকাবাবু আপাততঃ হাতীবাগান বাজারে যাচ্ছেন জিনিস কিনতে।

কি কিনতে যাচ্ছ কাকাবাবু ?

মাছ।

সে তো আজ ভজুয়া বাজার থেকে এনেছে।

সে মাছ নয় রে হাঁদা, আসল পোষবার মাছ। সোর্ড ফিশ্। এই বলে কাকাবাবু চলে গেলেন।

আমরা তখন নানা কল্পনা জুড়ে দিলাম। সোর্ড ফিশ্। না জানি তার কত বড় তরোয়াল! ধারালো না ভোঁতা। কাকাবাবু না আসা অবধি বোঝা যাচ্ছে না।

একটু একটু করে অনেক সময় কেটে গেল। প্রায় দু'ঘণ্টা বাদে মোড়ের মাথায় কাকাবাবুর আবির্ভাবের নিদর্শন পাওয়া গেল।

একটা কাচের জার দু'হাতে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে কাকাবাবু এগিয়ে আসছেন।

বাড়ির কাছে আসতে জিজ্ঞাসা করলুম, কাকাবাবু, পেয়েছো ?

কি ?

তরোয়াল মাছ।

হ্যাঁ।

কই, কই বলে আমরা ছুটে গেলাম।

বুকের উপর জড়িয়ে ধরা জারটা দু'হাতে মাথার উপর তুলে কাকাবাবু বললেন, আরে আরে সরে যা, ভেঙে যাবে যে! এই বলে কাকাবাবু এগিয়ে গেলেন। আমরা তাঁর পেছনে পেছনে চলতে শুরু করলুম। ঘরে এসে সেই মাছগুলো অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে কাকাবাবু বাইরে থেকে অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন।

জিজ্ঞেস করলুম আবার, তরোয়াল মাছ কই ?

অই তো—একটা মাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন।

দেখি একটা দেড় ইঞ্চি লাল রংএর মাছের পেছনে এক ইঞ্চি লেজ। ইংরেজী (M) এম্ অক্ষরটার একটা বাহু মাথার দিকে লম্বা করে মাঝখানের বসা জায়গাটার সঙ্গে জোড়া দিলে যেমন দেখায় লেজটা সেই রকম।

কাকাবাবুর দেখানো সোর্ড ফিশ্ দেখে আমি তো হাঁদারাম। এটা তো লেজ। তাই কাকাবাবুর কথায় বিশ্বাস না করে বলে বসলুম, ধেৎ!

কাকাবাবু বললেন, কি, বিশ্বাস হল না তো! জানি হবে না। এক কাজ কর। এখনি বাজারে গিয়ে আমার কথাটা পরখ করে আয়। আরে আমি কি না দেখে কিনেছি।

শুধু কাকা কেন যাঁরা মাছ পোষেন তাঁরা সকলেই ঐ রকম লেজওলা মাছকেই সোর্ড ফিশ্ বলে থাকেন।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে কাকা বললেন, ও বুঝেছি, তুই আসল সোর্ড-ওলা ফিশ্ দেখতে চাস, না? তা যদি চাস তাহলে ঘরে বসে হবে না। সাগরে যেতে হবে।

বললুম, চল।

কি আশ্চর্য, কয়েকদিন পরেই দেখি কাকা সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। জাহাজের টিকিট সুদ্ধু।

একটা জাহাজে করে যাত্রা শুরু করলুম। জাহাজটা প্রশান্ত মহাসাগরে উত্তরে চলতে লাগল। একটু দূরে চোখ পড়ল—একটা তিমি মাছ যাচ্ছে। আর তার কাছেই মাছশিকারী জাহাজ। জাহাজ থেকে হারপুন (harpoon) ছুঁড়ে মাছটাকে গেঁথে ফেলবার আগেই দেখা গেল একটা আট দশ হাত লম্বা মাছ ক্ষিপ্রগতিতে তিমি মাছটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

কাকা বলে উঠলেন, দেখ দেখ, তরোয়াল মাছ বা সোর্ড ফিশ্।

বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলুম। মাছটার উপরের ঠোঁটে একটা সরু তীক্ষ্ণ তরোয়াল সামনে বেরিয়ে আছে। এইটা মাছের ওপরের ঠোঁট ছাড়া কিছু নয়। এর নীচে ছোট ছোট ধারাল দাঁতের সারি।

দেখতে দেখতে মাছটা গিয়ে তিমিটার গায়ে প্রবলবেগে তার তরোয়াল বসিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পেছিয়ে এসে সেটা খুলে ফেললে।

আত্মরক্ষার জন্যে তিমিটাও তার লেজ দিয়ে জলের উপর প্রবল ঝাপটা মারলে। কিন্তু তরোয়াল মাছ এত সেয়ানা যে সেটা অনুমান করেই সরে গেছল তার লেজের কাছ থেকে।

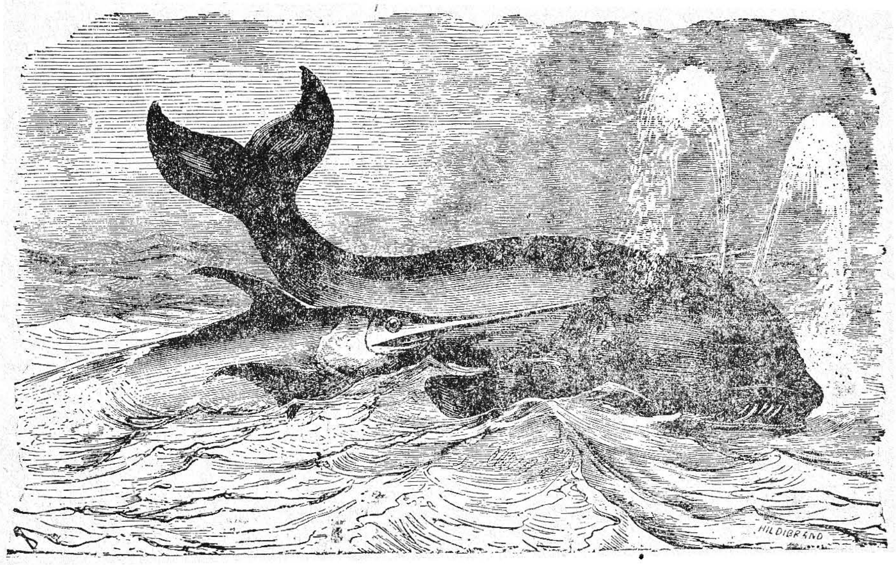

সরু তীক্ষ্ণ তরোয়াল সামনে বেরিয়ে আছে। [পৃষ্ঠা ২১৬

আবার এসে মাছটা তিমির গায়ে তার তরোয়াল বিঁধিয়ে দিয়ে সরে পড়ল। আবার তিমিটা ঝাপটা মারলে। তাদের ঝাপটাঝাপটির আওয়াজ বহুদূর থেকে শোনা যেতে লাগল।

শেষ অবধি তিমি মাছকেই হার স্বীকার করে প্রাণ দিতে হল তরোয়াল মাছের হাতে।

তরোয়াল মাছের গায়ে যেমন জোর স্বভাবও তেমনি রুক্ষ। আমরা অবাক হয়ে যাই মাছটার পরের কাণ্ডকারখানা দেখে। তিমিটাকে মেরে সে মাছশিকারের জাহাজটাও আক্রমণ করে বসে। তার তীক্ষ্ণ তরোয়ালের আঘাতে জাহাজের কাঠের তলা ফুটো হয়ে যায় আর ঠোঁটটা তাতে আটকে থাকে।

অনেকক্ষণ তরোয়াল খোলার বৃথা চেষ্টা করে মাছটা শেষ অবধি এক ঝটকা মেরে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। কিন্তু তরোয়ালটা ভেঙে জাহাজের কাঠেই আটকে থাকে।

এই গোঁয়ার্তুমির ফল মাছটাকে হাতে হাতেই পেতে হয়। খানিক বাদে দেখি প্রাণ হারিয়ে সে জলের উপর ভাসছে।

বীরবলের কাহিনী

রবিদাস সাহারায়

গোপাল ভাঁড়ের গল্প তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ? গল্পগুলি শুনলে খুব হাসি পায়, না? গোপাল ভাঁড় কে ছিলেন জানো? তিনি ছিলেন নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার ভাঁড় বা বিদূষক। বিদূষকদের কাজ হচ্ছে রাজারাজড়াদের সঙ্গে থাকা এবং নানারকম হাস্যকৌতুকের দ্বারা তাঁদের মন খুশী রাখা।

ভাঁড় যে কেউ হতে পারে না। ভাঁড় হতে গেলে উপস্থিতবুদ্ধি থাকা চাই এবং লোককে হাসাবার প্রচুর ক্ষমতা থাকা চাই।

রাজা বীরবলের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ? বীরবল কিন্তু শুধু ভাঁড় ছিলেন না, তিনি ছিলেন কবি এবং একজন বীর যোদ্ধা। তিনি আকবরের সভাকবি এবং সেনাপতিও হয়েছিলেন।

বীরবল কোথাকার লোক এ সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। কেউ বলেন তিনি আজমীরের লোক, কেউ বলেন তাঁর জন্মস্থান দিল্লী, কেউ বলেন মথুরা, কাশী। তবে ঐতিহাসিকদের মতে বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কোন্ গ্রামে বীরবল জন্মগ্রহণ করেন।

বীরবলের আসল নাম মহেশ দাস। পিতার নাম ছিল গঙ্গা দাস। অল্প-বয়সেই বীরবল পিতৃহীন হয়েছিলেন। গ্রামের এক জীর্ণ কুটীরে তিনি বিধবা মায়ের কাছে বাস করতেন। অতিশয় দুঃখকষ্টে তাঁদের দিন কাটতো।

কি করে এই গরীব অখ্যাত ছেলেটি সম্রাট্ আকবরের সভায় স্থান পেলে সেই কথাই এখন বলব।

ছোটবেলা থেকেই মহেশ দাসের বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর ছিল। বাড়ির কাছে এক পাহাড় থেকে বালক মহেশ রোজ কাঠ কেটে আনতো এবং সেই কাঠ বিক্রি করে পয়সা রোজগার করতো। একদিন পাহাড়ে গিয়ে অনেক কাঠ কাটলো। কাঠগুলি যেই বাঁধতে যাবে তখনি দেখলো বোঝা বাঁধবার দড়িটা বাড়িতে ফেলে এসেছে।

সেখান থেকে বাড়িটা দেখা যায়। তবে দূর ছিল অনেকটা। তার উপর পাহাড়ের চড়াই-উতরাই পথ।

তখন সেখান থেকে চেঁচিয়ে মাকে ডাকতে লাগলো। বললো—মা, দড়িটা দিয়ে যাও, ভুলে ফেলে এসেছি। কিন্তু তাঁর মা ছিলেন তখন কাজে ব্যস্ত, কাজেই বললেন তিনি যেতে পারবেন না।

মহেশ দেখলো, বাড়ি গিয়ে দড়িটা আনতে অনেক সময় লেগে যাবে। তখন চিন্তা করতে লাগলো কি করবে। একটু চিন্তা করতেই তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো।

তাদের ঘরের কাছেই পোষা কুকুরটা শুয়ে ছিল। মহেশ চেঁচিয়ে বললো—মা, দড়িটা কুকুরের গলায় জড়িয়ে দাও। মা তাই করলেন। মহেশ শিস দিয়ে কুকুরটিকে ডাকলো। কুকুরটি সাড়া পেয়েই ছুটে গেল মহেশের কাছে। মহেশ অমনি কুকুরের গলা থেকে দড়ি খুলে তাই দিয়ে কাঠের বোঝা বেঁধে ঘরে ফিরলো।

সেই সময় পাহাড়ের নীচে মাঠে একটি যুবক ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। যুবকের পরনে দামী পোশাক। তিনি দূর থেকে বালকের এই বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তারপর তাকে কাছে ডাকলেন। মহেশ বোঝা মাথায় করেই যুবকের দিকে রওনা হল। আসবার সময় তাকে একটি খাল পার হয়ে আসতে হয়। অবশ্য খালে জল বেশী ছিল না। খুব তাড়াতাড়িই সে পার হয়ে যুবকের কাছে এসে হাজির হল।

মহেশ কাছে এলে যুবক তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। মহেশ এমন সুন্দর-ভাবে তার জবাব দিল যে যুবক তার কথাবার্তায় এবং ব্যবহারে খুব মুগ্ধ হলেন। খুশী হয়ে তাকে একটি মোহর পুরস্কার দিলেন।

মহেশ আনন্দে আত্মহারা হয়ে বাড়ির দিকে চললো। সে ফেরবার সময় আগের মত সহজে খালটা পার হতে পারলো না দেখে যুবক মহেশকে আবার ডাকলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আসবার সময় যেমন সহজে খালটা পার হয়ে এসেছিলে, ফেরবার সময় তা পারলে না কেন?

মহেশ হেসে জবাব দিল, একে মাথার উপর কাঠ তার উপর আপনার দেওয়া পুরস্কার, এ সবের জন্য বোঝাটা এত ভারী হয়ে গেছে যে তা নিয়ে সহজে খাল পার হতে পারলুম না। মহেশের এই উত্তরে যুবক আরও মুগ্ধ হলেন। বুঝলেন ছেলেটির ভয়ানক রসবোধ আছে। বললেন, তুমি যাবে আমার দরবারে?

দরবারে! মহেশ তো অবাক। লোকটি বলে কি?

মহেশ জানতো না এই যুবকই সম্রাট্ আকবর। শিবিরে ফিরে গিয়ে মহেশকে তিনি নিজের কাছে আনিয়ে রাখলেন। এই ভাবেই মহেশের ভাগ্য গেল খুলে।

মহেশ মুখে মুখে অনেক কবিতা রচনা করতে পারতো। সংগীতেও তার ছিল নৈপুণ্য। এই দুই গুণে মুগ্ধ হয়ে সম্রাট্ আকবর তাকে নিজের সভায় স্থান দিলেন। পরে তাঁকে রাজা উপাধি দিয়ে জায়গীর প্রদান করলেন এবং সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক করে দিলেন। তারপর থেকেই মহেশ রাজা বীরবল নামে পরিচিত হতে লাগলেন।

বীরবল সম্বন্ধে অনেক মজার মজার গল্প আছে।

একদিন আবিদ আলী নামে রাজদরবারের এক কর্মচারী এসে বীরবলকে বললেন, শেঠজী, আমি বড় বিপদে পড়েছি। আমার বাড়ি থেকে টাকার বাক্স চুরি গেছে। তাতে অনেক টাকাপয়সা ছিল।

বীরবল জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কাকে সন্দেহ হয়?

আবিদ আলী বললেন, আমার বাড়িতে আছে ছ'জন চাকর। আমার মনে হয় তাদের মধ্যেই কেউ টাকার বাক্সটা নিয়েছে। কিন্তু হাতেনাতে ধরতে পারিনি বলে কোতোয়ালকে খবর দিতেও পারছি না। কারণ কোতোয়াল সবাইকে গারদে পুরে রামধোলাই দেবে। আপনি এর একটা ব্যবস্থা করে দিন।

বীরবল তখন বললেন, আচ্ছা আপনি বাড়ি যান।

আবিদ আলী চলে গেলেন। সন্ধ্যাবেলা বীরবল বাজার থেকে একই মাপের ছয়টি সরু বেতের ছড়ি কিনে আনলেন। তারপর গিয়ে হাজির হলেন আবিদ আলীর বাড়িতে। আবিদ আলী বীরবলকে আদর করে বৈঠকখানায় বসালেন। তারপর তাঁর নির্দেশ অনুসারে ছ'জন ভৃত্য সেখানে এসে উপস্থিত হল।

বীরবল বললেন, তোমাদের মনিবের টাকার বাক্স চুরি গিয়েছে অথচ তোমরা কেউ স্বীকার করছ না কে চুরি করেছে। কাজেই আমাকে অন্য একটি উপায় বেছে নিতে হবে। আমার হাতে এই ছ'গাছি ছড়ি দেখছো। এ ছড়ি সহজ নয়, ফকির রামালুর মন্ত্রপড়া ছড়ি। তোমাদের প্রত্যেককে একগাছা করে ছড়ি দিচ্ছি। প্রত্যেকটি

ছড়ি সমান মাপের। আজ রাত্রে তোমরা প্রত্যেকে আলাদা ঘরে শোবে। যে টাকার বাক্স চুরি করেছে, তার ছড়ি দু' আঙুল পরিমাণে বেড়ে যাবে। কাল সকালে পরীক্ষা করে তারপর যে দোষী তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

বীরবলের আদেশ মতো কাজ হল। ছ'জন ভৃত্য ভিন্ন ভিন্ন ঘরে শুয়ে রইল।

রাত ক্রমে গভীর হল। যারা নির্দোষ তারা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে লাগলো। কিন্তু যে চুরি করেছে তার চোখে ঘুম নেই। সে ভাবতে লাগলো আজ রাত্রের মধ্যেই তার ছড়িটা দু' আঙুল পরিমাণ বেড়ে যাবে। তার আগেই এক কাজ করি, দু' আঙুল কেটে বাদ দিয়ে রাখি।

এই ভেবে সেই ভৃত্য ছুরি দিয়ে তার ছড়িটি দু' আঙুল পরিমাণ কেটে ফেললো।

পরদিন সকালেই বীরবল এসে হাজির হলেন আলী সাহেবের বাড়ি। আলী সাহেবের সামনেই ভৃত্যদের ডাকলেন। ভৃত্যরা এসে হাজির হল। সবার হাতে সেই ছড়ি। বীরবল বললেন, এবার তোমাদের ছড়িগুলি পরীক্ষা করে দেখা হবে। কিন্তু তার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই। কাল একটা কথা বলতে আমার একটু ভুল হয়েছে।

সবাই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কি ভুল?

বীরবল বললেন, আমি কাল ভুলে উলটো কথা বলেছিলাম। যে চুরি করেছে, তার ছড়ি বড় হবে না, দু' আঙুল ছোট হবে।

যে ভৃত্যটি চুরি করেছিল এবার সে কেঁদে বীরবলের পা জড়িয়ে ধরলো। দেখা গেল তার ছড়ি অন্য ছড়িগুলোর চেয়ে দু' আঙুল ছোট।

বীরবল বললেন, তুমি চুপি চুপি টাকার বাক্সটি বের করে দাও, তোমাকে কোন শাস্তি দেওয়া হবে না।

ভৃত্যটি লুকানো জায়গা থেকে টাকার বাক্সটি এনে দিল। আলী সাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, শেঠজী, এগুলি কি সত্যি মন্ত্রপড়া ছড়ি?

বীরবল হেসে বললেন, মন্ত্রফন্ত্র কিছু নয়। শুধু বুদ্ধির কেরামতি।

একবার আকবর দিল্লীর প্রাসাদে বসে বীরবলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন

এমন সময় একটা কাক তাঁদের সামনে দিয়ে উড়ে গেল। সম্রাট্ হেসে বীরবলকে জিজ্ঞাসা করলেন, বল তো বীরবল, এই দিল্লীতে কতগুলো কাক আছে?

বীরবল কিছুমাত্র না ভেবে উত্তর দিলেন, সম্রাট্, ঠিক এই সময়ে দিল্লীতে নিরানব্বুই হাজার ন'শ নিরানব্বুইটি কাক আছে।

সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সত্যি বলছ?

বীরবল বললেন, আমার কথায় সন্দেহ হয় তো নিজে গুনে দেখতে পারেন।

সম্রাট্ হেসে বললেন, যদি গুনে কম দেখতে পাই?

বীরবল জবাব দিলেন, যদি কম হয় তো বুঝবেন তাদের কেউ দিল্লীর আশে-পাশে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। আর যদি বেশী হয় তো জানবেন তাদের বন্ধুবান্ধবেরা তাদের সঙ্গে দেখা করতে দিল্লীতে এসেছে।

এর উপর সম্রাট্ আর কোন কথা বলতে পারলেন না। মনে মনে খুবই খুশী হলেন বীরবলের বুদ্ধি দেখে।

* * *

১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আফগানরা সম্রাট্ আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে বীরবল তাঁর সেনাদল নিয়ে কাবুলের সেনাপতি জৈন খাঁকে সাহায্য করবার জন্য কাবুলে যান।

কিন্তু তাঁকে আর ফিরে আসতে হয়নি। সেখানে একদিন রাত্রিকালে আফগানরা তাঁর শিবির আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করে।

বীরবলের মৃত্যুসংবাদ যখন আকবরের কাছে পৌঁছল তখন দুঃখ করে আকবর বললেন, আমার সভার একটি ইট আজ খসে পড়ল।

● বাবা ঠাণ্ডা

বাবা—ওগো তোমার মেয়ে ছাত্র-ছাত্রী আন্দোলনে নেচেকুঁদে এখন ইতিহাস পরীক্ষায় ফেল করেছে।

মা—দোষটা তো মেয়ের নয়, শিক্ষকদের। তাঁরা কেন এমন ঘটনার কথা প্রশ্ন করেন যা মেয়ে জন্মে অবধি দেখেনি।

শুঁটকি আর মুটকি
তোয়ালেতে কি করছ মা ?
যার যার নাম লিখে রাখছি তোমাদের।
যে যার তোয়ালে ব্যবহার করবে। কেউ কারওটা ছোঁবেনা
মা নামগুলো এত ছোট করে লিখেছে যে বোঝাই যায়না। আর তাহলেই তো যত গণ্ডগোল হবে।
তুই ঘর থেকে মোটা বুরুশটা নিয়ে আয়। আমি ঠিক করে লিখে দিচ্ছি।
দেখ এবার কেমন দূর থেকেই পড়া যাবে।
শুঁটকি
আমার তোয়ালেটা দেওতো।
এই শুঁটকি! তোর বাবার তোয়ালেটা দিয়ে যা তাড়াতাড়ি।
এইযে বাবা! তোমার তোয়ালে। তুমি আজ খুব ব্যাস্ত বুঝি ?
হ্যারে, আজ অফিসের বড় দেরী হয়ে গেল।
এই যাঃ! বাবা লেখাটাকে একেবারে ধেবড়ে দিলে।
ওঃ! আজ আমাকে উড়ে বেরিয়ে যেতে হবে।
এটা অফিস! সং সাজবার জায়গা নয়!

(ক্রমশঃ)

মজার পাতা
নূতন ধাঁধা

১। পদহীন তবু আমি চলিতে সক্ষম,
পাখা আছে, পুচ্ছ আছে, উড়িতে অক্ষম।

—কাতিকচন্দ্র মাইতি, মনোহরপুর, হুগলী।

২। পক্ষীটাকে উলটালে ভাই জন্তু হয়ে যায়,
দেখলে পরে সকলেতে অবাক হয়ে চায়।

—শচীন ও বাণী চক্রবর্তী, খাস ঝরিয়া কলিয়ারী, ধানবাদ।

৩। চপলা চমকি উঠি ত্যজিল সে চন্দ্রে,
অন্ন ছাড়ি' পলাইলেন বিষ্ণু মহামন্দ্রে।
পড়িয়া রহিল যাহা লয়ে কুড়াইয়া
খাইতে লাগিল সবে আপন ভুলিয়া।

—শ্রীভাগবত সামন্ত, কিসমত বাজকুল, মেদিনীপুর।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। ভারত ২। গাধা ৩। নজরুল ইসলাম

গত মাসের সমস্ত ধাধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—বীথিকা, অঞ্জনা ও মালবিকা—বিবেকানন্দ রোড; শিল্পী ও সজল বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা ৬; গোপাল, গোবিন্দ, গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, সন্ধ্যা ও আরতি—রবীন্দ্র সরণি; সাণী, অপু, পিকু, দীপু, তপু ও বাপু—সি. আই. টি. রোড; অনিন্দ্য ও মিতালী—৩৩ নং এভিনিউ সাউথ; রত্না, রীতা, স্বাতী, বাবা, মা, কৃষ্ণা ও শিবানী—দমদম; শ্যামল, সোমনাথ, শুভ্রা, চন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ, নিমাই প্রভৃতি—সিকদারবাগান স্ট্রীট; দেবাশীষ, দেবমিত্রা ও দেবজ্যোতি সেনগুপ্ত—রসা রোড সাউথ, থার্ড লেন; নারায়ণী ঘোষ, দিদা ও জ্যাঠামণি—উমাকান্ত সেন লেন; সমীর, সতু, বিলাসদা ও দাদা—পণ্ডিতিয়া রোড; দিলীপকুমার দে—১৭৫৫৯; রজতাভ, সৌমাভ, শম্পা ও রুমা মিত্র—ঝামাপুকুর লেন; মা, বাবা, কস্তুরী, ধ্রুব, মেজমা ও ভাস্কর—ডি. এল. রায় স্ট্রীট; মনু, ফুলদি, ছোড়দি, মেজদি ও বৌদি—পণ্ডিতিয়া রোড; শিবানী দাস—সিমলা স্ট্রীট; শম্ভু, রঘু, ভাই, রঞ্জি ও টঙ্গি—শ্যামপুকুর লেন; পিনাকী, স্বপ্না ও বুলু মিত্র—রবীন্দ্র সরণি; অশোক, তুষার ও তপন দত্ত—রাজকৃষ্ণ চ্যাটার্জী রোড।

চব্বিশ পরগনা—রানী, মনু, মীরা, নিতাই, অশোক, অজিত ও গৌরাঙ্গ সেনগুপ্ত—খড়দহ; কাজল, কৃষ্ণা, কেয়া, চন্দন, মনু, মা ও বাবা—ব্যারাকপুর; তপন, ধ্রুব, নূপুর, পুলক, সুপ্রিয়া ও মিতা সেনগুপ্ত—জগদ্দল; রাণু, বুলা ও রমলা সান্যাল—হরিনাভি; সত্যব্রত, মা, বাবা, দাদা, ছোড়দা, পিসীমা, দিদি প্রভৃতি—বেলঘরিয়া; সোনালী, দীপালি, বুলা, বুড়ন, সলিল, বাচ্চু এবং সুষমা সেনগুপ্ত—রহড়া; বালি, কাজল, হারু ও রঞ্জিৎ ভট্টাচার্য—হরিনাভি।

হাওড়া—অশোক, অরুণ ও শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়—শিবপুর; বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়—হালদার পাড়া লেন; শ্রীলেখা, বনশ্রী, সোমনাথ ও অমিত—বেণী মিত্র লেন; খুকু, ভজা, পালু ও জুলু—ফুলেশ্বর।

হুগলী—মৈত্রী, দেবাঞ্জন, প্রীতি ও মামণি—চুঁচুড়া; শুক্লা, শঙ্কর, শেখর ও মিঠু—ভদ্রেশ্বর; কাকু, নাগা, রিণ্টি ও রিঙ্কা—কাঁঠালগাড়িয়া; জয়শ্রী, ব্রততী ও মহুয়া সেন—উত্তরপাড়া; বিশ্বনাথ, দেবানন্দ, বাসুদেব ও সুব্রত সেন—উত্তরপাড়া; মঞ্জু, নীলাঞ্জনা ও শোভা বসু—কোন্নগর; চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া; মৃদুলা, মলয়া ও অমিতাভ মল্লিক—হুগলী; মা, বাবা, দীপা ও ঝুমুর—ডানলপ; দাদু, বড়মা, মা, কনক, তোতন ও রবীন ব্যানার্জী—নারায়ণপুর; মিতা, পিয়ালী ও মা—উত্তরপাড়া।

বর্ধমান—গোরা, ডালিয়া ও কুন্তী—আসানসোল; তুলতুল, বাদল ও সব্যসাচী—চিত্তরঞ্জন; অঞ্জন সরকার—খণ্ডঘোষ; রবি, বিনু, সনৎকাকু ও গুঁট—বাঁকশিমূলা কলিয়ারী।

মেদিনীপুর—ভাগবত সামন্ত, বিজন মাইতি ও শ্রীধর সামন্ত—কাখুরিয়াবাড়ি।

বাঁকুড়া—স্বপন ব্যানার্জী, গোপাল রায় ও নিশীথ চট্টরাজ—বেলিয়াতোড়।

পুরুলিয়া—অরূপ, অনুপ, গৌতম, মালা, সুস্মিতা প্রভৃতি—পুরুলিয়া; চতুর্ভুজ, শশীভূষণ, বীণাকণ্ঠ ও বাউলচন্দ্র মাজী—গোবিন্দপুর; অকূল, জয়ন্তী, বাসন্তী ও শান্তি সেন—আদ্রা; বেলা, শীলা, ইলা, বুলা, মা ও বাবা—পুরুলিয়া।

পশ্চিম দিনাজপুর—নারায়ণ, রেণুকা, বীণাপাণি, দেবেন্দ্র, মধুমিতা, শেফালী ও বাসন্তী—বালুরঘাট।

বিহার—অভিজিৎ, পার্থসারথি ও উত্তরা—সিন্দ্রী; অলক ও কুমকুম বসুচৌধুরী—জামসেদপুর-৯; বিজয়, নরেন, মানু ও মামণি—বররাগড় কলিয়ারী; মা, শচীন ও বাণী চক্রবর্তী—খাস ঝরিয়া কলিয়ারী; গৌরী ভট্টাচার্য—নওয়াদা; স্বপন, সাধন, বুড়ু, হাসু ও খুকু—ধানবাদ; লেবু, দাদু, দিদিমা ও ডল—খাস ঝরিয়া কলিয়ারী; স্বপন মিত্র ও রেবতী সিন্হা—হিরাপুর; কৃষ্ণা, লক্ষ্মী, ফাল্গুনী, নিবেদিতা, উমা প্রভৃতি—দুমকা; প্রণব, অর্ণব, অলক মামা ও সুব্রত পাল—মুজঃফরপুর; স্বাধীন ও স্বরাজ মুখোপাধ্যায়—মুজঃফরপুর; নীলরতন, সুপ্রভাত, পৃথ্বীশ ও সুরঞ্জন রায়—দুমকা; নির্মল, নীলু, তপন, ছবি, প্রতিমা, ঝর্ণা প্রভৃতি—দুমকা; দিলা, চিলা, স্বপ্না, বুনি, ভুবনি, পুটুন প্রভৃতি—খাস ঝরিয়া কলিয়ারী; সতী, জুয়ু, বাবলু, টিয়া, চিনু, মিনু ও ছোটন—ধানবাদ।

মধ্যপ্রদেশ—ঝর্ণা ও তুলিরেখা মিত্র—জি. সি. এফ. এস্টেট।

গত মাঘ, ১৩৭০ সংখ্যার সমস্ত ধাঁধার বাকি উত্তরদাতাদের নাম

মেদিনীপুর—জগদীশ জানা ও প্রণতি মাইতি—বাহাদুরপুর; চিত্তরঞ্জন ও প্রজাপতি মাইতি—বাজকুল; কানু, বুলু, পৃথ্বীশ, অনিল, মহেন্দ্র ও ভূমীন্দ্র—মিরবাজার; অরুণ, বরুণ, কুমকুম, জগদীশদা, শান্তি, পপী ও সুকুমার—খড়্গপুর; হৃষীকেশ ও কিশোরীমোহন মাইতি—বাজকুল; অজয়কুমার সামন্ত—কাখুরিয়াবাড়ি; সরোজকুমার রায়—মেদিনীপুর; বিজন মাইতি ও ভাগবতচন্দ্র সামন্ত—কাখুরিয়াবাড়ি; দেবু, অনীতা ও শঙ্কর সরকার—১৯৬০০।

বীরভূম—পিয়ালি, তপতী, সুদীপ্ত, শান্তশীল ও চম্পক দাস—শান্তিনিকেতন; কৃষ্ণা, কাবেরী, বাবা, মা, দীপ্তিকাকু ও দিদিভাই—হেতমপুর; প্রভাংশু সিংহ—১৮৫৯৫।

বাঁকুড়া—বাচ্চু, রবি, মা ও বাবা—লালবাজার; শৈবাল ও প্রবাল গুপ্ত—নূতনচটী; বাবা, মা, বাপী, কৃষ্ণা, শীলা প্রভৃতি—আমডাংরা; গদাইমামা, শঙ্করমামু, ঝুমরু ও মুন্নী—বিষ্ণুপুর; বংশী, অজিত, রবীন্দ্র, বলাই ও শ্যামাপ্রসাদ—বাঁকুড়া নন্দী হোটেল; তুফান, ঝিলিক, জয়, শম্পা ও টুটুল—নূতনচটী।

মালদহ—প্রতিভা, গুপী, সীমা, খ্যান্ত ও চাঁপা—১৭৯২৯।

পুরুলিয়া—দিলীপ কুমার চৌধুরী—মধুপুর; অনিমেষ ঘোষাল ও অসীম ঘোষ—বলরামপুর; খুকুদি, সমীরদা ও শুভেন—গড়জয়পুর; অকূল, বাসন্তী, জয়ন্তী, শান্তি, গীতা ও সন্ধ্যা সেন—আদ্রা; মণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও খুকনমোহন সিং—রাঙ্গাডি; মেনা, গাপা, বুড়ুকু, শেফালী, দীপালি ও বাবলু—বলরামপুর; দীপালি, প্রদীপ, দেবাশীষ, শেফালী ও মিতালী ব্যানার্জী—রাঙ্গাডি; পাপড়ি চন্দ—১৭২৩৩; মিনু ও কাকু—কুশটার্ড।

দার্জিলিং—শ্যামলী, মিতালী, উৎপল ও পলু সামন্ত—মংপু।

জলপাইগুড়ি—মৃণাল, মৃদুল, মুকুল ও মমতা চক্রবর্তী—তণ্ডু চা বাগান; তপনকুমার ভট্টাচার্য—রেলওয়ে ফিডার রোড।

বিহার—কাকু, মীনা ও মাধু—ধানবাদ; তাপ্তী, শিউলি ও অঞ্জনা—সিন্দ্রী; সুমিত, তড়িৎ ও সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়—আরা; তপতরু, বিশ্বরত্ন ও ভক্তিদেব রায়

রাঁচী ; মলিন, সৌমেন, ভগবান প্রভৃতি—মহুদা ; অরবিন্দ, চন্দ্র, বীরেন্দ্র, নলিনী, জীতেন্দ্র ও সত্যেন্দ্র—১৮৯৩৯ ; মঞ্জু ও অঞ্জলি সান্যাল—পূর্ণিয়া ; 'কদমা সঙ্ঘমিত্র'র ভাই ও বোনেরা—জামসেদপুর-৫ ; নীহার, মলিন, মলয় ও অসামদা—মহুদা ; মামা, সুধীরদা, নীহারিকা ও অসীম-কুমার নাথ—মহুদা ; অমিতাভ, পূর্ণিমা ও মধুছন্দা—জামসেদপুর ; নরেশ ভট্টাচার্য—জামসেদপুর-৫ ; কৃষ্ণ, সদানন্দ, পঙ্কুভাই, পাঁচুদা, শিবু, ভুবন প্রভৃতি—গামারিয়া ; বঙ্কিম, অমরেন্দ্র, বেণীমাধব, পূর্ণ, রবি প্রভৃতি—গামারিয়া ; নিরঞ্জন করগুপ্ত—জামসেদপুর ; সতী বিশ্বাস, বাচ্চু বিশ্বাস ও হাঙ্গি সেন—সিন্দ্রী ; অমলদা, শ্যামশ্রী, কান্তিক ও দেবকুমার—ঘাটশীলা ; অলক, অরুণ, ঊষা, তপন, মানিক প্রভৃতি—ভালগোড়া কলিয়ারী ; টিটি, বুবলু, টুবলু, টিকলু, কিটি ও মিঠি—জামসেদপুর ; তপনী ঘোষাল—পাটনা-৪ ; মা, শচীন ও বাণী চক্রবর্তী—খাস ঝরিয়া কলিয়ারী ; বীথিকা, সিতুকণা, দীপু, তপু, গোপা ও প্রকাশ বসু—জামসেদপুর-৩ ; বিধান, স্নেহময়, রাণা, বৌদিরা, মিতু ও ডল—গন্দুড়ি কলিয়ারী ; পার্থ, সমর, তাপস, কৃষ্ণা, করবী, শম্পা, ভাস্কর ও শঙ্কর—১৯৬৩৬ ; বড়দা, শীলা, দীপু, হাসি, খুকু ও তাপস চ্যাটার্জী—সিন্দ্রী ; চয়নিকা ও সাগরিকা মৈত্র—সিন্দ্রী ; বিজন, বিদ্যুৎ ও সমীর পাণ্ডা—সাকচী ; মা, মামা, দীপ্তি, তৃপ্তি, ফাগু, গোপাল প্রভৃতি—ঝরিয়া ; শুভ্রেন্দু চক্রবর্তী—মুজঃফরপুর ; নীলিমা, শুভা, মঞ্জুলা, শ্যামলী, খোকন ও মামা—সিন্দ্রী ; সবিতা, রত্না, লাবি ও হাসকা রায়—১৬৪৩১ ; শুভ্রা ও শিপ্রা রায়—এগ্রিকো ; অলক ও কুমকুম বসু চৌধুরী—জামসেদপুর-৯ ; পম্পা ও বিউটি বাগচী—এগ্রিকো; বাসুদেব, পূর্ণেন্দু, দিলীপ, বড়মা, জেঠা, মা ও মধুদা—ঝুমকা ; বাপ্পা, স্টেলা ও টুকটুকী—মগমা ; স্বরাজ, স্বাধীন, অপর্ণা, মা ও বাবা—বিরণি পুকুর।

উড়িষ্যা—দীপঙ্কর ও মাধুরী প্রামাণিক—রাউরকেল্লা-২।

আসাম—বিভাসরঞ্জন চৌধুরী—শিলচর ; আণ্টু, বাবুল, ইলু, দাদা, বাবা, মা ও মামা—গৌরীপুর ; বাবুল, পিপলু, ভুলু, ডালু, মণ্টু, ডলি, গীতা প্রভৃতি—তিনসুকিয়া ; পরিমল, পরিতোষ, পরাগ, প্রীতিকণা, পূরবী ও পম্পা চক্রবর্তী—হাইলাকান্দি।

উত্তরপ্রদেশ—গৌরী, বাসন্তী, সঞ্জয়, সুপ্রিয়া ও অজয়—১৬১৭১।

মধ্যপ্রদেশ—কৃষ্ণা বিশ্বাস—কোত্মা ; মা ও তুলিরেখা মিত্র—জব্বলপুর।

পঞ্জাব—জয়া সেনগুপ্ত—১৯৩৫৮।

মহারাষ্ট্র—দীপ্তি ঘোষাল—নাগপুর।

● মা-ছেলে

মা তাঁর চারবছরের ছেলেকে কাগজ কলম নিয়ে বসে থাকতে দেখে কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন, খোকা ! একলা বসে কি করছ ?

খোকা—আমার ছোট ভাইকে চিঠি লিখছি।

মা—(বিস্মিত হয়ে) তুমি তো এখনও লিখতে শেখনি।

খোকা—তাতে কি হয়েছে ? ছোট ভাই এখনও পড়তে শেখেনি !

● মিষ্টি কথা

কোন এক স্কুলের হেডমাস্টার নীচুক্লাসের ছাত্রদের বলে রাখলেন, স্কুল পরিদর্শক এসে তোমাদের সঙ্গে কথা বললে তোমরা মিষ্টি করে কথা বলবে। যখন স্কুল পরিদর্শক এসে ক্লাসে সত্যিই প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, ছেলেরা বলতে শুরু করলে, রসগোল্লা সন্দেশ পানতুয়া রসমালাই…

খুশি মত কর স্ট্রেট ড্রাইভ

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

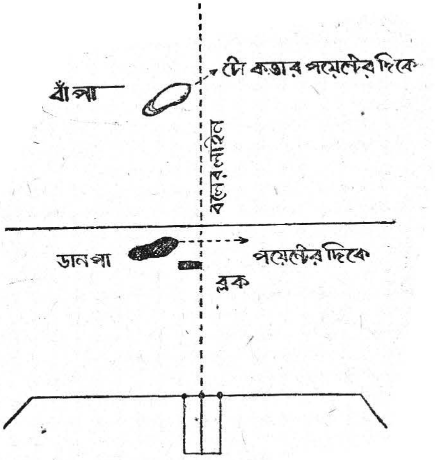

এবার আমরা যে ড্রাইভএর বিষয় আলোচনা করবো, সেইটাই সব শেষ এবং সব থেকে সহজ মার। সহজ বলবো এই কারণে যে আমরা অফ ও অন ড্রাইভ করতে শিখে গেছি। অফ আর অন ড্রাইভ করতে পারলে স্ট্রেট ড্রাইভের জন্যে কোন

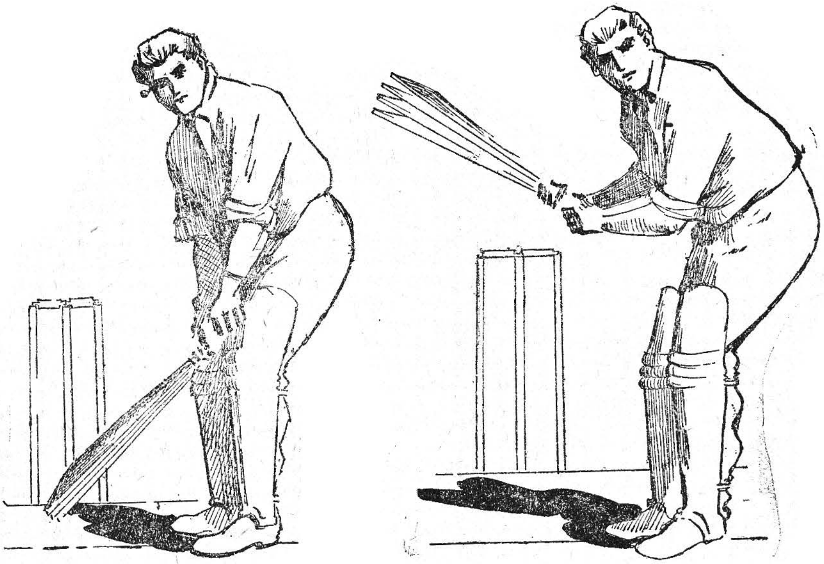

(১নং ছবি) ...স্ট্রেট ড্রাইভ শুরু

ভাবনা নেই। অন্য ড্রাইভের কায়দাগুলো রপ্ত হয়ে থাকলে স্ট্রেট ড্রাইভ খুব সহজেই করতে পারবে।

(২নং ছবি) ...ব্যাক লিফ্‌ট থেকে ব্যাটটা নেমে আসছে।

তবে একটা বিষয়ে খুব সাবধান থাকবে। খুব নিশ্চিত না হয়ে আর ভালোভাবে ড্রাইভ করতে না শিখে কখনও স্ট্রেট ড্রাইভ করতে যেয়ো না। কারণ স্ট্রেট ড্রাইভ মারা হয় উইকেটের ওপরের সোজা বলগুলোয়। তাই টাইমিংএ একটু গণ্ডগোল হয়ে গেলেই বোল্ড আউট হয়ে যাবে, কিংবা বোলারের হাতে সোজা ক্যাচ তুলে দিয়ে ফিরে আসতে হবে প্যাভেলিয়নে।

স্ট্রেট ড্রাইভ মেরে খুব সহজে রান পাওয়া যায়। কারণ বোলার বল করার পর ফলো থ্রুর সময় একটু জোরে মারা বল তুলে নিতে পারেন না। আর মিড অফ বা মিড অন ছুটে যাওয়ার আগে অনেক সময় বল বেরিয়ে যায়। তাই হিটে জোর থাকলে ব্যাটসম্যান অনেক সময় স্ট্রেট ড্রাইভ করার জন্যে চার-রান পেয়ে যান। তোমরা কিন্তু লোভে পড়ে হুট করে মারতে যেয়ো না। ঠিক ভাবে মারতে পারা সম্বন্ধে নিশ্চিত হলে তবেই মারবে। না হয়তো ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ স্ট্রোক করবে। ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ স্ট্রোক সম্বন্ধে শুকতারায় ক'মাস আগে চিত্র সহকারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(৩নং ছবি) ···বলে হিট করার পর ব্যাট আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে।

স্ট্রেট ড্রাইভ করার কায়দা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই। অফ ড্রাইভ আর অন ড্রাইভ করার যে কায়দা তোমরা শিখেছ, স্ট্রেট ড্রাইভের বেলায় সেই একই কৌশল ফলাতে হবে। সেখানে এতটুকুও পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু এই যে, স্ট্রেট ড্রাইভের বেলায় অফে বা অনে না ঝুঁকে অর্থাৎ অফের বা অনের দিকে না মেরে মারতে হবে সোজা। অবশ্য স্ট্রেট ড্রাইভের জন্যে সাধারণতঃ উইকেটের ওপর সোজা হাফ ভলী বলগুলোই বেছে নেওয়া হয়।

ছবিতে দেখো স্ট্রেট ড্রাইভ করার সময় ব্যাটসম্যানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এবং ব্যাটের অবস্থা কেমন। প্রথম ছবিতে দেখো স্ট্রেট ড্রাইভ আরম্ভ করার সময় ব্যাটসম্যানের দু'পায়ের অবস্থা কেমন হয়। বাঁ পা এগিয়ে গেছে বলের লাইনে। ডান পা পপিং ক্রীজের ভেতর। ডান পা'র বুটের টো পয়েন্টমুখো আর বাঁ পা'র টো কভার পয়েন্টের দিকে মুখ করে আছে।

(৪নং ছবি) ···ফলো থ্রু

পরের ছবিগুলোতে দেখো ব্যাক লিফ্‌ট থেকে ব্যাটটা কেমন ভাবে নেমে আসছে। ব্যাটে বল লাগার মুহূর্তে এবং ঠিক তার আগের মুহূর্তে ব্যাটসম্যানের শরীরের কি অবস্থা ভালো ভাবে লক্ষ্য কর। ব্যাটের ভেতর অনেক জোর আছে, চোখের দৃষ্টি সকল সময় বলের ওপর।

বলে হিট করার পর ব্যাট আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। একে বলে ফলো থ্রু। তখন শরীরের সমস্ত ভার বাঁ পায়ের ওপর, ডান পা'র বুটের টো শুধু ছুঁয়ে আছে মাটিতে।

চার রকম ড্রাইভের কায়দা তোমাদের শেখা হয়ে গেল। এখন দরকার শুধু প্রাকটিশের। দিনের পর দিন প্রাকটিশ করে করে ড্রাইভ করার এক একটি কৌশল খুব ভালো ভাবে রপ্ত করে নাও। ভালো ভাবে ড্রাইভ করতে পারলে দেখবে তুমি খুব সহজে অনেক রান করতে পারছ। ড্রাইভ করার সব থেকে বড় সুবিধে এই যে এই মারগুলোয় যেমন রান ওঠে খুব তেমনি আউট হবার সম্ভাবনাও খুব কম। তবে ড্রাইভের কায়দা সম্পূর্ণভাবে রপ্ত করতে সময় লাগবে অনেক আর লাগবে কড়া প্রাকটিশ।

এস. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১নং ঝামাপুকুর লেন হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য—৫০ নয়া পয়সা

আর এক মাসের জন্য

বিশেষ সুবিধা

আশুতোষ দেব প্রণীত

শব্দবোধ অভিধান

চতুর্থ সংস্করণ

পৃষ্ঠা ১৬৫০ **মূল্য ১২৲ টাকা**

অভিধানের মূল্য ১২৲ টাকা, ডাক খরচ ৩৲ টাকা মোট ১৫৲ টাকা। ১৫৲ টাকার স্থলে ১২৲ টাকা অগ্রিম পাঠালে রেজেষ্ট্রি ডাকে বই পাঠান হবে।

জনশিক্ষা গ্রন্থমালা

প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য	... '৭০
এঁদের ভুলো না	... '৭০
বিল্বমঙ্গল	... '৭০
রূপ সনাতন	... '৭০
মহাভারতীয় গল্প	... '৭০
পুরাণের গল্প	... '৭০
পল্লীগীতি কাব্যকথা	... '৭০
জাতকের গল্প	... '৭০
উপনিষদের গল্প	... '৭০
ভাগবতের গল্প	... '৭০
ভারত-নারী	... '৭০
মঙ্গল কাব্যের কথা	... '৭০
জ্ঞান ও কর্ম্মে বাঙ্গালী	... '৭০
সাহিত্যে বাঙ্গালী	... '৭০
রামায়ণী কথা	... '৭০
ধর্ম্মে বাঙ্গালী	... '৭০
দেশপ্রেমে ভারতবাসী	... '৭০

দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত

অপরূপা

● আধুনিক সাইজ ● আধুনিক গেট্‌আপ্‌ ● অনেক ছবি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইস্‌লাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বনফুল, প্রবোধকুমার সান্যাল, সুনির্মল বসু, বুদ্ধদেব বসু, হেমেন্দ্রকুমার, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, অচিন্ত্যকুমার, শিবরাম

প্রভৃতি ৪০ **জন বিশিষ্ট লেখকের গল্প, কবিতা** প্রভৃতি এতে পাবেন।
তাছাড়া অসংখ্য ছবি দাম—পাঁচ টাকা।

দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত

নব পত্রিকা

৺সুকুমার রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, সুনির্মল বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, সুখলতা রাও, আশাপূর্ণা দেবী, শৈলজানন্দ, বনফুল, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, অন্নদাশঙ্কর, হেমেন্দ্রকুমার **প্রভৃতি ৫০ জন নাম করা সাহিত্যিকের এমন সব রচনা এতে আছে যা আজকের দিনের কিশোর-কিশোরীদের কাছে অমূল্য।** ছবিতে ভরা ৪৪৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ...দাম—৪৲ টাকা

দেব সাহিত্য কুটীর—২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

বাহির হয়েছে! বাহির হয়েছে!!

রং চং-এ ছড়ার বই

ইকড়ি মিকড়ি

সম্পাদনা—মধুসূদন মজুমদার

মূল্য—১৲ টাকা

সুন্দর কাগজে নানা রংএ অফসেটে ছাপা

শিশু উপন্যাস

নির্মলকুমার রায়

একটি ছেলের কাহিনী

মূল্য—টা. ২'০০

সুনির্মল বসু

হাসিকান্না

মূল্য—টা. ১'০০

দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত

রঙীন আকাশ

মূল্য—টা. ২'০০

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ

পরাজিত এভারেষ্ট

মূল্য—টা. ১'২৫

সামুক

ছেলেধরা সার্কাস

মূল্য—টা. ১'০০

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

রত্নদ্বীপের বিভীষিকা

মূল্য—টা. ১'০০

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

অজানা দেশে

মূল্য—টা. ১'২৫

অজানার উজানে

মূল্য—টা. ১'৫০

শৈলবালা ঘোষ

রঘু সর্দার

মূল্য—টা. ১'৫০

গদাধর নিয়োগী

মিনু ও কাপালিক

মূল্য—টা. ১'৫০

নারায়ণ গঙ্গোঃ ও নিমাই বন্দ্যোঃ

মরণের মুখোমুখী

মূল্য—টা. ১'০০

অশোক শাস্ত্রী

স্বর্গে থিয়েটার

মূল্য—টা. ১'২৫

৩৩ খানি পূজা বার্ষিকী

১। ছোটদের চয়নিকা ৪'০০
২। ছোটদের গল্প সঞ্চয়ন ৪'০০
৩। ঝলমল ৪'০০
৪। আজব বই ৪'০০
৫। শিশু-গল্পিকা ৪'০০
৬। সোনার কাঠি ৪'০০
৭। যাদুঘর ৪'০০
৮। চিত্রদীপ ৪'০০
৯। মায়ামুকুর ৪'০০
১০। সোনালী ফসল ৪'০০
১১। মধুমালা ৪'০০
১২। রূপরেখা ৪'০০
১৩। বর্ষ-মঙ্গল ৪'০০
১৪। আলপনা ৪'০০
১৫। রাঙারাখী ৪'০০
১৬। নবারুণ ৪'০০
১৭। অঞ্জলি ৪'০০
১৮। আবাহন ৪'০০
১৯। উদয়ন ৪'০০
২০। অভিষেক ৪'০০
২১। পরশমণি ৪'০০
২২। বসুধারা ৪'০০
২৩। ইন্দ্রধনু ৪'০০
২৪। দেবালয় ৪'০০
২৫। জয়যাত্রা ৪'০০
২৬। নব পত্রিকা ৪'০০
২৭। অপরাজিতা ৪'০০
২৮। দেব দেউল ৫'০০
২৯। অপরূপা ৫'০০
৩০। শারদীয়া ৫'০০
৩১। অলকনন্দা ৫'০০
৩২। ছোটদের মাধুকরী ৪'০০
৩৩। শ্যামলী ৫'০০

দেব সাহিত্য কুটীর—২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯